প্রকৃত তত্ত্ব

"পরিপূর্ণমনাদ্যন্তমপ্রমেয়বিক্রিয়ম।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥"

"জয় সত্যের জয়।"
"জয় ব্রহ্মের জয়।"
"জয় প্রেমের জয়।"
"জয় মহারাজের জয়।"

শ্রীমদাচার্য্য আনন্দস্বামী
কর্তৃক বিবৃত

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
গ্রাম+ডাকঘর : ভোলাচং, থানা- নবীনগর
জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪১০, বাংলাদেশ

ভূমিকা
(প্রথম সংস্করণ)

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত এই গ্রন্থের পঞ্চপঞ্চাশৎটি বিষয় তৎশিষ্য শ্রীযুক্ত কামিনীকান্ত ঘোষ সর্ব্বসাধক মহাশয় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের কার্য্য আমাকে করিতে হইয়াছে। আমাদের লিপিকরণ ও মুদ্রাঙ্কণে সংশোধনাদি বশতঃ যদি কোন বিষয়ের ভাষা ও ভাবগত ব্যতিক্রম, বৈলক্ষণ্য বা বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, সে দোষ আমাদেরই। এই পুস্তক আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেই ভাল হইত। কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই।

এই পুস্তক-গত বিষয় সকল সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "এই পঞ্চপঞ্চাশৎটি বিষয় জগতের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সন্দেহ নিরাকরণার্থে যতই উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইবে, ততই সাধ্যসাধনার যোগ মনুষ্য মনে প্রকাশিত হইয়া জীবন সংশোধন করতঃ ধর্ম্মজীবনে পরিণত করিবে এই ধারণা আমার মনে প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে। যদি কেহ সরল বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এতদ্বিরুদ্ধে কোন অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কিংবা পত্র দ্বারা তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলে আমি তাহা খণ্ডন বিষয়ে চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প রহিলাম।

স্বামী মহাশয়ের রচিত আদিম সঙ্গিতাবলী হইতে পাঁচটি এবং মধ্য ও বর্ত্তমান সময়ের কয়েকটি সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন এ সঙ্গে প্রকাশিত হইল। সঙ্গীত-বিভাগের সমুদয়ই আমার সংগ্রহ, সুতরাং এ বিভাগের ভ্রম ও ত্রুটির জন্য আমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। উপসংহারে বক্তব্য এই যে আমাদের কৃত ভ্রম-প্রমাদের দ্বারা যদি এই পুস্তকের কোন ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা নিতান্ত অনুতপ্ত হইব। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক।

২৫ শে আষাঢ়
১২৯০ বাংলা।

নিবেদক–
শ্রী দয়াল চন্দ্র ঘোষ।

ভূমিকা

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মানব জীবনের অতি জটিল সমস্যা-সকল মীমাংসার জন্য পিতাঠাকুর শ্রীমদাচার্য্য আনন্দস্বামী, যে পঞ্চপঞ্চাশৎটি সূত্র ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাই, আমার আশৈশব সখা এবং প্রাণের বন্ধু স্বর্গীয় দয়াল চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক, অদ্য প্রায় ২৭ বৎসর হইল, প্রকৃত তত্ত্ব নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ সংস্করণ বহুদিন হইল নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। অনেকেই ঐ পুস্তক পাইতে ইচ্ছা করেন দেখিয়া, আমি ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা প্রথমেই অবিকল দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণে পিতৃদেবের কিঞ্চিৎ পরিচয়ার্থে, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত এবং আমার স্বীয় জীবনের যোগে তাঁহার মহান ও অলৌকিক জীবনের অতি সামান্য আভাস মাত্র এস্থলে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

পিতাঠাকুর মহাশয় ১২৩৯ সালে বৈশাখ মাসে স্বনামখ্যাত সাধক স্বর্গীয় রামদুলাল দেওয়ান মহাশয়ের ঔরসে জন্মগ্রহন করেন। তাঁহার জন্ম সময়ে জগন্মাতা মহাশক্তি স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন, পিতামহ ঠাকুর উক্ত দেওয়ানজি মহাশয় এইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জীবনের শেষ সময়ের পূর্ব্বে ইহা প্রকাশ করেন নাই। লীলা সংবরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন তাঁহার পত্নী অতিশয় অধীরা হইয়া তাঁহার নিকট বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন পত্নীর নিকট ঐ কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। বলিলেন– “আমি তোমাকে যে পুত্ররত্নের হস্তে রাখিয়া যাইতেছি সে সামান্য লোক নহে, সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে আমি দেখিয়াছি মা স্বয়ং তাহাকে কোলে করিয়াছেন; তুমি যে পুত্রধনে ধনী তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধন এই জগতে সম্ভবে না।” আমার জন্মের পূর্ব্বের আর একটি উপদেশপূর্ণ ঘটনা– আমার মনে হয় যেন পিতাঠাকুর মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি,– এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। কুমিল্লা জিলা স্কুলে তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শীতা লাভ করিয়াই, কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইহা জানিতে পারিয়া পিতামহ ঠাকুর রামদুলাল দেওয়ানের নিকট এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া বলেন, “আনন্দ যে সংস্কৃত ভাষা ভাঙ্গাচূড়া করিতেছে ইহা ভাল নহে।” তৎপর ঠাকুরদাদা বাবাকে ডাকিয়া বলিলেন “যদি কোহপি ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্র লঙ্ঘনে ক্ষমঃ তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ” এবং এই শ্লোকটি ভিন্ন আর কিছুই বলিলেন না। ইহাতে বাবাও স্বীয় আরদ্ধ কার্য্য হইতে বিরত হইলেন।

আমার শৈশব জীবনের যে সময় হইতে ভাব বাক্য কার্য্যাদি আমার স্মরণ আছে তদবধি পিতাঠাকুর মহাশয় একটি আদর্শ নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল চরিত্ররূপে আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছেন; এবং সকল লোকের মুখেও এইরূপ কথাই সর্ব্বদা শুনিয়াছি। আমি শিশুকালে তাঁহাকে নিয়ত দীর্ঘকালব্যাপী শিব পূজায় রত দেখিয়াছি। আমাদের বাড়ীতে একটি স্কুল ছিল। আমার খুল্লতাত ঁকৈলাসচন্দ্র নন্দী মহাশয়কে লেখাপড়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনে দূরদেশ হইতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শী শিক্ষক সকল আনিয়া নিজ বাড়ীতে এই স্কুলটি সংস্থাপন করেন। স্বীয় উদারতা বশতঃ এই সুযোগে ভ্রাতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বালকদিগকে নিজ ব্যয়ে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াই এই স্কুলের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

সময় সময় শিক্ষক না থাকিলে নিজেই স্কুলের অধ্যাপকের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ঐ সময় আমি লিখিতে পড়িতে বিশেষভাবে আরম্ভ করি নাই। তখন আমার বয়স ৭/৮ বৎসর ছিল। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে তৎকালে তিনি শিব পূজায় এতদূর একাগ্রচিত্ত ছিলেন যে অনেক দিন স্কুলের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পূজা শেষ হয় নাই। ছাত্রগণ স্কুল গৃহে কোলাহল করিয়া সময় কাটাইয়াছে।

১২৬৯ সালে আমার নবম বৎসর বয়সে উপরোক্ত খুল্লতাত মহাশয়ের সহিত আমাকে কুমিল্লা জিলা স্কুলে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রায় তিন বৎসর কাল আমরা কুমিল্লাতেই ছিলাম। ঐ সময় বাবা স্বর্গীয় কালীনাথ নন্দী

মহাশয়ের সহিত একযোগে পর্ব্বতে যাইয়া হাতীর খেদা করিয়াছিলেন। ঁকালীনাথ নন্দী মহাশয় শ্রীহট্ট জিলায় বিশেষ যশোর সহিত পুলিশ ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিতেছিলেন; অদ্যাপি তাঁহার যশঃ সৌরভ সমস্ত শ্রীহট্ট জিলায় পরিব্যাপ্ত। তিনি সম্পর্কে বাবার খুড়া হইতেন; এবং আমাদিগের বংশের বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। হাতীর খেদাতে যাইয়া উক্ত কালীনাথ বাবুর সহিত অবস্থান কালেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া বাবার মূর্ত্তি উপাসনার দিকে বিরাগ জন্মে এবং ধর্ম্মবীর রামমোহন রায়ের উপাসনা-প্রণালীর অনুমোদন করিতে আরম্ভ করেন।

১২৭৭ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৮৬৬ ইং প্রথম ভাগে আমরা কুমিল্লা হইতে ঢাকা যাই। ঐ বৎসর ১৮৬৬ ইং ডিসেম্বর মাসে খুল্লতাত কৈলাসচন্দ্র নন্দী মহাশয় ১০ টাকা বৃত্তি পাইয়া এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। আমরা ঢাকা যাইবার কিছুকাল পূর্ব্বেই বাবা ঢাকা ইছলামপুরে একটি Dispensary বা ঔষধের দোকান ডাক্তার জানকীনাথ সেন ও ডাক্তার আনন্দ কিশোর সেনের সহিত একযোগে খুলিয়াছিলেন। আমাদের ঢাকা নগরীতে অবস্থিতির ব্যয় নির্ব্বাহই এই কারবারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কারবারটি লাভ জনক হয় নাই। আমাদের ঢাকা অবস্থিতি কালে বাবা অনেক সময় তথায় যাইয়া অবস্থিতি করিয়াছেন। ঐ সময়েই ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ সংস্থাপিত হয়। ১২৭৪ কি ১২৭৫ বাঙ্গালায় ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠাকালে বাবা এবং খুল্লতাত মহাশয় ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহন করেন; ১২৭৭ বাঙ্গলা আশ্বিন মাসে স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম বন্ধুসহ বাড়ীতে আসিয়া কালীকচ্ছে প্রথম ব্রহ্মোৎসব করেন। শৈশবে শিব পূজায় তাঁহার যেইরূপ একাগ্রতা দেখিয়াছি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও উপাসনাকালে ধ্যানমগ্ন ভাব সেইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী ছিল এইমাত্র লক্ষ্য করিয়াছি। আমি ১৮৭১ ইং ডিসেম্বর মাসে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া পাস হই। এই সময় হইতেই আমার মনে জড়বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হয় এবং তজ্জন্য দুই বৎসর ঢাকা কলেজে পড়িয়া তৎপর মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য কলিকাতা যাই। সেই হইতে আমি জড় শক্তির ধ্যানে এবং জড় শক্তিকে কি উপায়ে মানুষের কার্য্যে খাটান যায় সেই চিন্তায় এতদূর নিমগ্ন ছিলাম যে ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম জগতের দিকে একেবারে ফিরিয়া চাহি নাই। এইভাবে প্রায় ৪ বৎসর কলিকাতায় থাকি। আমার কলিকাতা অবস্থিতির শেষ বৎসরে বাবা সপরিবারে আসিয়া কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করেন। তখন আমার জড় ধ্যানমগ্ন চিত্তে তাঁহার ভাব এবং কার্য্যে কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি যে তাঁহার ঈশ্বর উপাসনার প্রধান অঙ্গই ধ্যান ছিল এবং সময় সময় ঈশ্বরবাণী যাহা পাইতেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে সকলের নিকট প্রচার করিতেন। আমি ঐ সকলের ভাব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই কেবল একজন অসংসৃষ্ট দর্শকরূপে দর্শন করিয়াছি। ১২৮৩ সালে কার্ত্তিক মাসে পিতা ঠাকুর কলিকাতা হইতে সপরিবারে ঢাকা নগরীতে আসেন। তথায় খুল্লতাত উপরিউক্ত স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া অপর সকলকে ঢাকা রাখিয়া বিবাহের সময়ে যে সকল দ্রব্যাদি বিশেষ প্রয়োজন হইবে তাহা আনিবার জন্য একা বাড়ী চলিয়া যান। বাড়ীতে আসিয়াই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি আর ফিরিয়া ঢাকায় গেলেন না। শুনিয়াছি দুই তিন দিবস আহার নিদ্রার অভাব কিছুমাত্র অনুভব না করিয়া অবিচ্ছেদে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকিতেন। ঐ সময়েও প্রত্যেক রবিবার এক একটি নূতন কীর্ত্তন রচনা করিয়া পাড়ার কয়েকজনকে লইয়া উপাসনা মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপ অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া ফাল্গুন মাসের শেষভাগে ঢাকা হইতে মাতা ঠাকুরাণী এবং ভগিনীদ্বয় বাড়ী চলিয়া আসিলেন। ঐ সময় হইতেই অনেক লোক তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। অপর দিকে কেহ কেহ তাঁহার বাক্যাদির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। আমি ঐ সময়ে কাপড়ের কল ও দিয়াশলাই এর কল লইয়া এত মগ্ন ছিলাম যে বাড়ীর ঐ সকল খবর কিছুই পাই নাই। বাড়ী আসিয়া যাহা শুনিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত রামকানাই দত্ত দাদা মহাশয় ঐ সময়ের একটি ঘটনা আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন এ স্থলে তাহা উল্লেখ করিতেছি। কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বাড়ীতে একাকী অবস্থান কালে বাবা সময় সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যাইয়া থাকিতেন। পৌষের শেষে কিংবা মাঘের প্রথম ভাগে তিনি কিছুকাল তথায় ছিলেন। ঐ সময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আসেন। এক দিবস সমাজে উপাসনান্তে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "আনন্দ, তুমি নাকি ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পার? বল দেখি আমার একটি ভগ্নী কি অবস্থায় আছেন?"

বাবা একটু ধ্যানস্থ হইয়া বলিলেন "বড় দুর্গন্ধ, লোক কাছে যাইতে পারিতেছে না।" গোস্বামী মহাশয় ইহা শুনিয়া অশ্রুবিগলিতনেত্রে বলিয়া উঠিলেন "আনন্দ তুইই পাইয়াছিস্।"

ঐ সনের চৈত্র মাসে উল্লিখিত কালীনাথ নন্দী মহাশয় আমাকে অগৌণে বাড়ী চলিয়া আসার জন্য পত্র লিখিলেন। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই ছিল "তোমাদের অনেক মহাজন নালিস করিয়াছে, কেহ কেহ ডিক্রী লাভ করিয়া তোমাদের ভূসম্পত্তি নিলাম করাইতে প্রস্তুত। তোমার পিতা সাংসারিক কাজে একেবারেই বিরত। সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্ত ায় নিমগ্ন থাকেন। তুমি এখন বাড়ী না আসিলে চলে না, পত্রপাঠ চলিয়া আসিবা।"

ঐ পত্র পাইয়া আমি ১২৮৩ সনের চৈত্র মাসের শেষভাগে বাড়ী চলিয়া আসিলাম। ১২৮৪ সনের প্রথম হইতে ১৩০৭ সনের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ২৩ বৎসর আমি প্রায় বাড়ীতেই পিতৃদেবের নিকট রহিয়াছি। এই ২৩ বৎসরের প্রথম ২ বৎসর কাল সম্পূর্ণ অস্ফুট, তৎপরবর্ত্তী ৭ বৎসর স্ফুটনোন্মুখ এবং শেষ ১৪ বৎসর ঈষৎ বিকশিত জ্ঞানালোকে তাঁহার অপার্থিব জীবন ও কার্য্যকলাপ যাহা সন্দর্শন করিয়াছি নিম্নে তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে লিখিতে চেষ্টা করিব।

আমি বাড়ী আসিবার পরেই উক্ত কালীনাথ দারোগা মহাশয়ের প্রস্ত াব অনুসারে বাবা এক দানপত্র দ্বারা যাবতীয় সম্পত্তি আমাকে লিখিয়া দিয়া সাংসারিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ অবসর হইলেন। আমি সংসারের ভার প্রাপ্ত হইয়া প্রথমেই ঋণ পরিশোধের জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। আমার মন তখন অধ্যাত্ম বা ধর্ম্মজগতের দিকে সম্পূর্ণ বিমুখীন্। বাবার বাক্য ও কার্য্যাদির মর্ম্ম কিছুমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বরং তৎপ্রতি মনে বিরুদ্ধ ভাব ছিল। এক দিবস বাবা আমাকে কোনও একটি কথা বলিয়া বলিলেন, "এইরূপ ঈশ্বর-বাণী হইয়াছে" আমি তাঁহার মুখের উপরই বলিয়া উঠিলাম "আমি বাণী টানি কিছুই বুঝি না, বা মানি না।" কিন্তু তাঁহার কার্য্যাদির মধ্যে এইমাত্র লক্ষ্য করিয়াছি দিনের বেলা বাহির বাড়ীর দালানের কোঠায় একা বসিয়া থাকিতেন। অধিক সময়ই দরজা বন্ধ থাকিত। রাত্রের প্রথম ভাগে কিছুকাল তাঁহার শয়ন কক্ষে থাকিতেন। কিছু অধিক রাত্র হইলেই বাহির বাড়ীর আঙ্গিনায় দক্ষিণ দিকে একখানা চেয়ার পাতিয়া অবশিষ্ট রাত্র বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার পায়খানারও একটা দরজা প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন; ঐ পায়খানায় অন্য কেহ যাইতে পারিত না। আহার সর্ব্বদা করিতেন না, দুই তিন দিবস পরে কিছু সিদ্ধ ভাত আহার করিতেন। মা'ও সঙ্গে সঙ্গে উপবাস থাকিতেন। আমি শিশুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি মা উপবাস থাকিতে খুব অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু বাবার তিন বেলা আহার এবং অন্যান্য শারীরিক নিয়ম স্বাস্থ্য- বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুযায়ী ছিল। অথচ ঐ সময়ের ভাব দেখিয়া আমার অজ্ঞানাচ্ছন্ন শুষ্ক মনও চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারিল না। যাঁহাকে আহারের সময় অতিক্রম করিয়া আহার করিতে কখনও প্রায় দেখি নাই, তিনি দুই তিন দিবস উপবাসে কোনরূপ দৈহিক গ্লানি অনুভব করিতেছেন এইরূপ একটুকুও লক্ষ্য হয় নাই। কিন্তু মাতা ঠাকুরাণী পূর্ব্ব হইতে উপবাসে অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও যেন একেবারে এলাইয়া পড়িতেন। অনাহারে দেহ ক্লিষ্ট বলিয়াই স্পষ্ট অনুভূত হইত।

আমি বাড়ী আসার পর কিছুদিন নির্দ্দিষ্ট দুই একজন লোক ভিন্ন কেহই তাঁহার নিকট যাইতে পারিত না। অল্প কয়েক দিবস পরেই ক্রমে অধিক লোক তাঁহার নিকট আসিতেছে দেখিতে লাগিলাম অথচ ঐ সকল লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া কোনও কথা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে উদয় হয় নাই। কেবল এইমাত্র দেখিতাম যে ঐ সকল লোকের মধ্যে কেহ কেহ ভক্তিভাবে তাঁহার নিকটে টাকা পয়সা

কিংবা দ্রব্যাদি দিত। বাহিরে এই কথাও রাষ্ট্র হইল যে তাঁহাকে দিতেছে বলিয়া কেহ কিছু দিলে উহা গ্রহণ করিতেন না। দয়াময় ঈশ্বরের নামে দিতেছে বলিলে গ্রহণ করিতেন। দিন দিনই অধিক সংখ্যক লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। ঐ সকল লোক কি আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে তাহা আমি কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই কিংবা তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষাও আমার মনে উদয় হয় নাই। ১২৮৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কনিষ্ঠা ভগ্নীদ্বয়ের বিবাহ স্থির করিয়া এক দিবসেই দুই বিবাহ দিলেন। ঐ দুই বিবাহ সভায় এরূপ অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিন চারি ঘণ্টাব্যাপী উপাসনাতে উপস্থিত সমুদয় ব্যক্তি বিগলিত হৃদয়ে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্পন্দবিহীন হইয়া সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমার অজ্ঞানাচ্ছন্ন জড় ভাবাপন্ন শুষ্ক হৃদয়ও সময়ের দীর্ঘতা কিছুমাত্র উপলব্ধি না করিয়া অবাক হইয়া অনন্যমনে উপস্থিত ব্যাপারে মগ্ন ছিল।

নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত এবং জীবন সংগ্রামে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ ও ধর্ম্মশিক্ষার্থী এই তিন প্রকারের লোক-সকল ক্রমেই বর্দ্ধিত সংখ্যায় তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিল। সকলেরই অন্ন আমাদের সঙ্গেই প্রস্তুত হইত কিন্তু তাঁহার নিকট যে টাকা পয়সা ও দ্রব্যাদি আসিত তদ্দ্বারাই এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যায় বলিয়া এ বিষয়ে কোন আপত্তি করা বা প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবার ইচ্ছা হয় নাই।

অল্পদিন মধ্যেই প্রতিদিন গড়ে প্রায় পঞ্চাশ জনের অন্ন প্রস্তুত হইতে লাগিল। মা'ও অতি উৎসাহের সহিত এই সকল লোকের অন্ন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। নিত্য উৎসবের ভাবে দিন যাইতে লাগিল। আমি অসংসৃষ্ট দর্শকরূপে কতক বিস্মিতচিত্তে এই সব দেখিতে লাগিলাম। কেহ কেহ অনেক অলৌকিক ভাব ও কার্য্যের বিষয় আমাকে বলিত। আমি ঐ সকল শুনিয়াও তৎপ্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করা আবশ্যক মনে করি নাই। এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর কাল চলিয়া গেল। ১২৮৫ সনের কার্ত্তিক মাসে আমি কুমিল্লা গিয়া জানিলাম আমার একান্ত প্রাণের বন্ধু রাণীদিয়া নিবাসী দয়ালচন্দ্র ঘোষ রুগ্নদেহে একান্ত নিরাশ মনে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দেরাদুন প্রভৃতি স্থলে ভ্রমণ করিতেছে। তাহার রোগের অবস্থা জানিয়া আমার মনে হইল বাড়ী চলিয়া আসিলে আমি তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিব এবং এই মর্ম্মে কুমিল্লা হইতে তাহাকে একখানা চিঠি লিখিলাম। কুমিল্লা হইতে বাড়ী আসিয়াই ঐ চিঠির জবাব পাইয়া জানিলাম যে আমার অনুরোধ মত সে শীঘ্রই বাড়ী আসিতেছে। কার্ত্তিকের শেষ কিংবা অগ্রহায়ণের প্রথমভাগে দয়াল আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল এবং আমি তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম। ঁদয়ালচন্দ্র ঘোষ আমার আশৈশব বন্ধু, আমার ভগ্নীর বিবাহের পর তাহার সহিত আর একটি সম্বন্ধ হইয়াছিল। সে আমার ভগ্নীপতি ঁগুরুদয়াল সিংহ মহাশয়ের সম্পর্কে ভাগিনেয় ছিল সুতরাং বাবাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিত এবং তাঁহার সহিত সময় সময় ঠাট্টা তামাশাও করিত। এক দিবস বাবার সহিত আমরা সকলে আহার করিতে বসিয়াছি, এমন সময় দয়াল বাবাকে ঠাট্টা করিয়া বলিল "ঠাকুরদাদা! আপনার কথার মর্ম্ম আমরা ত কিছুই বুঝি না। অদ্য ১২ বৎসরের অধিক কাল নিরামিষ খাইতেছেন, বোধ হয় ইহাতে মস্তিষ্কে ফসফরাসের অভাব হইয়াছে।" বাবা ইহা শুনিয়া একটু হাসিলেন কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে একমাস না যাইতেই দয়ালের পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ পরিহাসের ভাব চলিয়া গেল এবং সর্ব্বদা বাবার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল এবং অতিশয় পুলকিত ও বিস্মিত হইয়া আমাকে বলিল "এতকাল ব্রাহ্ম সমাজে থাকিয়া ধর্ম্মের যে সকল জটিল সমস্যা কিছুমাত্র ভেদ করিতে পারি নাই, সে সকল এখন ঠাকুরদাদার নিকটে যাইয়া তাঁহার উপদেশে নিঃসংশয়ভাবে বোধগম্য হইতেছে। জীবনের যে সকল পন্থা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল তাহা যেন এখন তাঁহার আলোকে পরিষ্কাররূপ দেখিতেছি।

এই হইতে আমার জীবনেও এক নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল। সেই সময়ে আমি বাবার নিকট কখনও যাই না কিংবা তাঁহার সহিত উপাসাদিতেও যোগদান করিতাম না, তথাপি দয়ালচন্দ্র ঘোষের মধ্য দিয়া তাঁহার আলোক আমার চিত্তকে ক্রমে কিছু কিছু আলোকিত করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও আমি ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে

পারি নাই যে আমার অজানিত ভাবেই আমার মধ্যে বিশেষ এক শক্তি ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করিতেছে।৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ আমার ঢাকা অবস্থান কালে আমাদের সহিত এক বাসায় থাকিত। আমি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িতে যাওয়ার কিছুকাল পরেই ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা ক্যাম্পবেল্ মেডিকেল স্কুলে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে এবং আমাদের সঙ্গে এক বাসায়ই থাকিত। আমি বাড়ী চলিয়া আসার অব্যবহিত পরেই ক্যাম্পবেল্ মেডিকেল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দয়াল রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং পরিবর্ত্তনের জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যায়। এই "প্রকৃত তত্ত্ব" তাঁহারই উদ্যোগে প্রথমবার মুদ্রিত হয়। প্রথমবারের ভূমিকা তাহারই লিখিত। প্রথম সময়ে যে সকল লোক বাবার নিকট নিয়ত উপস্থিত থাকিত তন্মধ্যে প্রধান কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। চট্টগ্রাম নিবাসী কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ৺পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিক্রমপুর দয়হাটা গ্রাম নিবাসী ৺কামিনীকান্ত ঘোষ, ধর্ম্মতীর্থ নিবাসী ৺চরণদাস কৈবর্ত্ত, মলাইস নিবাসী ৺ কাশীদাস কপালী এই সকলের মধ্যে ৺কামিনীকান্ত ঘোষ ধর্ম্ম শিক্ষার্থী হইয়া বৎসরাধিককাল অবিচ্ছেদে এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই "প্রকৃত তত্ত্ব" লিপিবদ্ধ হয়। বাবা আদেশবাণীরূপে বলিয়া যাইতেন ৺কামিনীকান্ত ঘোষ তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। প্রথম সংস্করণে দয়ালচন্দ্র ঘোষ এই ৺কামিনীকান্ত ঘোষের কথাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।৺কামিনীকান্ত ঘোষ ২/৩ বৎসরের মধ্যেই বিক্রমপুরে একজন বিশেষ সাধক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন এবং বহুসংখ্যক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার লীলা সম্বরণের পরেও তাঁহার বাটীস্থ দয়াময়ের আসনে বহুলোক যাতায়াত করিতেছে। এইরূপে অনেক লোক এখানে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়া স্ব স্ব প্রদেশে নানাভাবে আকুল মনুষ্যদিগকে শান্তি প্রদান করিতেছে।

দয়ালচন্দ্র ঘোষ এখানে আসিয়া অল্পকাল মধ্যেই দেহের শান্তি লাভ করিল। রোগমুক্ত হইয়াই সাংসারিক কাজ কর্ম্মের ভার আমার হাত হইতে নিজে টানিয়া লইল এবং আমাকে বলিল এই সকল কাজ কর্ম্ম তোমার নয়। যে পর্য্যন্ত এই সংসার ঋণ মুক্ত হইয়া সুশৃঙ্খল ভাবাপন্ন না হয় ততকাল আমি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম। জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তোমা হইতেই এই জীবন পুনরায় লাভ করিয়াছি মনে করিতেছি, সুতরাং তোমার কার্য্যেই এই দেহ মন সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করিলাম। এইরূপে ১২৮৫ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১২৯০ সালের বর্ষার শেষভাগ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ বৎসর কাল দয়ালচন্দ্র কালীকচ্ছ থাকিয়া একদিকে আমার জমি জমা জরিপ ও জমাবন্দী এবং ঋণ পরিশোধের কার্য্য অতিশয় অধ্যবসায়ের সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছে এবং অপরদিকে সর্ব্বদা বাবার নিকট যাইয়া তাঁহার জীবনের অতি উচ্চ আদর্শ এবং ধর্ম্মমত সকল অবগত হইয়া আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়াছিল। দয়ালচন্দ্র বাবার বিশ্বাস সম্বন্ধে ক্রমে যাহা ব্যক্ত করিয়াছিল তাহার সারমর্ম্ম এই–

১। একমাত্র অদ্বিতীয় জাগ্রত জীবন্ত ক্রিয়াশীল ও লীলাময় বিধাতা সর্ব্বকর্ত্তারূপে এই অনন্ত বিশ্বের সর্ব্বঘটে ক্রীড়া করিতেছেন। মানুষের কিংবা অন্য কোন জীবের ঈশ্বর ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। মায়া মুগ্ধ মানব নিজকে কতিপয় কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অবলোকন করে। এই ভক্তি ভাব ঈশ্বর ইচ্ছাতেই জগতে সকল মানুষের মনে বিচরণ করিতেছে। ইহাও ইচ্ছাময়ের জগত লীলার এক অঙ্গ, আবার তাঁহারই ইচ্ছাতে জগতে এই এক নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, নাম সাধন ও ধ্যানাদি দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার বাণী শ্রবণ ও তদ্দর্শন লাভ করিতে পারে। এইরূপ বাণী শ্রবণ ও দর্শন লাভ দ্বারা ঈশ্বরীয় যোগ লাভ হয় এবং তাঁহার সহিত যুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া স্বীয় ও পরকীয় জীবনের ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে পারে।

২। জগতের কোন ধর্ম্মই মিথ্যা নহে, সর্ব্বকর্ত্তা দয়াময় ঈশ্বর স্থান ও কালের উপযোগিতা মতে ঘট বিশেষকে উপলক্ষ করিয়া জগতে নানারূপ পূজাবিধি অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ লাভ করিয়া শান্তি লাভ করিবার জন্য নানাবিধ প্রণালী প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল ধর্ম্ম প্রণালী অকিঞ্চিৎকর মানবজ্ঞানসম্ভূত নহে, সুতরাং কোন ধর্ম্মকেই অবহেলার চক্ষে দর্শন করা যাইতে পারে না। কোন ব্যক্তিও কাল বিশেষের জন্য অনাবশ্যক হইলেও অপর মানব সম্প্রদায়ের জন্য বিধাতার বিশেষ আবশ্যকীয় বিধান বলিয়া পরিগণিত। আলোক ও

অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য এই দ্বন্দ্বভাব ঈশ্বর ইচ্ছাতে ও তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে জগতলীলা সম্পাদন করিতেছে। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা নয় তাহা কখনই অস্তিত্ব যোগ লাভ করিতে পারে না। ৩। মানুষ সকল মরে না। কেবল আবশ্যকমতে কখন বা আবির্ভূত ও কখন বা তিরোহিত হয়। প্রয়োজন হইলেই জগতে প্রকাশিত হইয়া লীলা বিস্তার করে। যে সকল লোক মরিয়া গিয়াছে বলিয়া সকলে মনে করে, তাহারা সকলেই কোন সময় পূর্ব্বকার ও স্থূলদেহে পুনরায় জগতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব পরিচিতের সহিত পরিচয় ও জীবন মুক্তি লাভ করিবে।

ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মমত সকলের প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি নাই কিন্তু ক্রমে মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল যে, এই সকলের মধ্যে নিগূঢ় সত্য রহিয়াছে। ১২৮৯ সনে দয়ালচন্দ্র আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া এবং অন্য সকল সাংসারিক বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। আমি একাই বাড়ীতে প্রায় এক বৎসর কাল রহিলাম। আমাদের বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে। ইহাও দেখিতে লাগিলাম এই অগণ্য লোক সকলের মধ্যে কেহই নিরাশ মনে ফিরিয়া যাইতেছে না। সকলেরই শান্তি লাভ হইতেছে। ১২৯০ সনের কার্ত্তিক মাসে পিতৃদেব কলিকাতা গিয়াছিলেন, তিনি বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রচন্দ্র জ্বর ও শোথ রোগে অতিশয় কাতর হইয়া পড়ে, বাবা বাড়ী না থাকায় পুত্রের মারাত্মক ব্যাধির বিষয় মনে করিয়া নিজের চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। এই সময়ে বাবা বাড়ীতে না থাকায় চারিদিক অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং পরিবারের সকলকে লইয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যভাগে কলিকাতা যাইয়া পৌছিলাম। বাবার নিকট উপস্থিত হইতেই মনের ব্যাকুলতা প্রায় দূর হইয়া গেল কিন্তু স্বীয় বিকারযুক্ত বুদ্ধির কার্য্য নির্ভরতার দ্বারা বিলুপ্ত হইল না; যদিও অনেক বিষয়ে বাবার উপর নির্ভর করিতাম, কিন্তু আহারের সময় পুত্র যাহাতে বাবার নিকট না যাইতে পারে তৎবিষয়ে বিশেষ যত্নশীল থাকিতাম। বীরেন্দ্র তখন উদরাময় রোগে অতিশয় কাতর ছিল। এই অবস্থায় বাবার সঙ্গে যা তা খাইলে অনিষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কা সর্ব্বদা মনে জাগ্রত থাকিত, মনের এই বিকৃতভাব জানিতে পারিয়াও আমাকে সাক্ষাৎভাবে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু অতি অলৌকিক ভাবে আমার এই মানসিক বিকারের মূলে অব্যর্থ কুঠারাঘাত করিলেন। এক দিবস কোনও এক বন্ধুর বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আহারের সময় সকলে উপস্থিত হওয়ার কিছুকাল পরেই শ্রীমান বীরেন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িল, ইহাতে কতক নিঃশঙ্কচিত্তে বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে আহার করিতে বসিলাম কিন্তু আমাদের আহার অর্দ্ধ সমাপ্ত না হইতেই শ্রীমান নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিল আমরা আহার করিতে বসিয়াছি। ইহা দেখিবা মাত্রেই সে প্রাণপণ চেষ্টায় টলিতে টলিতে আসিয়া বাবার কোলে বসিল। আমি উদ্বিগ্ন মনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। বুটের ডাইল প্রভৃতি যে সমস্ত উদরাময় রোগের অনিষ্টদায়ক বলিয়া মনে ধারণা আছে বালক তাহাই চাহিতেছে এবং বাবা সেই সমস্ত দ্রব্যই তাহার ইচ্ছামতে খাওয়াইতেছেন। নিঃশব্দে সমস্ত দেখিলাম কিন্তু ইহার ফল যে কি হইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। পর দিবস প্রাতঃকালে দেখিয়া অবাক্ হইলাম মাসাধিক কাল হইতে শ্রীমান যে উদরাময় রোগে ভুগিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গিয়াছে, একেবারে স্বাভাবিক বান্ধামল ত্যাগ করিল। আমরা অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ হইতে ফাল্গুনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কলিকাতা ছিলাম। ঐ সময়েই কলিকাতা ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিসন্ হইয়াছিল। আমরা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত এক বাসায়ই ছিলাম। সর্ব্বদাই দেখিতাম বাবার নিকট কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে গোস্বামী মহাশয় তথায় যাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া নাচিতে থাকিতেন। আমার তখনও ঐ সকল কীর্ত্তনাদিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা হইত না। কলিকাতা যাইয়াই রুগ্ন পুত্রকে পিতার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে, প্রায় সর্ব্বদাই এক্সিবিসন্ দেখিয়া বেড়াইতাম, কখনও কোনও কীর্ত্তন বা উপাসনাদিতে যোগ দেই নাই। মাঘ মাসে আমাদের বাসাতেই শ্রীমান দয়ালচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন হইল। এই বিবাহের পরেই দয়ালচন্দ্র বিষয় কর্ম্মে উদাসীন হইয়া গত এক বৎসর কালের উপার্জ্জিত অর্থের ব্যয়বিশিষ্ট বাবার চরণে অর্পণ করিয়া বলিল, আমি

আপনার কাছছাড়া কোথাও থাকিতে পারিব না। কালীকচ্ছ যাইয়া আপনার নিকটেই জীবন কাটাইব। ফাল্গুন মাসে পিতৃদেব আমাদের সকলকে এবং দয়ালচন্দ্র ও নববধূকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। এই ফাল্গুন হইতে তৎপরবর্ত্তী সনের জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত ঠিক পূর্ব্ববৎ দয়ালচন্দ্র ঘোষের মধ্য দিয়া পিতৃদেবের ভাব ও শক্তি অলক্ষিতভাবে আমার মধ্যে কার্য্য করিতেছিল। আমি তখনও তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি পুনরায় কলিকাতা যাইয়া ছাপার কালি প্রস্তুতের এক কারখানা খুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ঐ কার্য্যে তিন মাস কাল ব্যাপৃত থাকি। ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মাথার অসুখে কাতর হইয়া তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করিলে তাঁহার পরিবার সহ তাঁহাকে লইয়া বাড়ী আসিলাম। তৎপরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসে দয়াল জ্বর ও কর্ণমূল প্রদাহ রোগে আক্রান্ত হইয়া ভবলীলা সংবরণ করেন। এই সময় হইতেই আমার জীবনে এক বিশেষ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুভয়ে মন আকুল থাকিত। অনেক সময় এই আকুলতা বশতঃ রাত্রে নিদ্রা হইত না। কোন মতেই চিত্ত স্থির করিতে না পারিয়া বাবার নিকট উপস্থিত হই, তিনি একখানা "প্রকৃত তত্ত্ব" আমার হাতে দিয়া বলিলেন "ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমৎ স্বরূপ সম্বন্ধে ইহাতে যাহা লিখা আছে তাহা পড় হৃদয় শান্ত হইবে।" এই সময়ে ঢাকা যাওয়া আবশ্যক হওয়ায় তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। আমার অন্তরের আকুলতা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়া বলিলেন "ঢাকা যাওয়া আবশ্যক কিন্তু তোমাকে একা যাইতে হইবে না, আমি এবং তোমার মাতা ও পরিবারের সকলে তোমার সঙ্গে যাইব।" এই বাক্যে আমার ভীত ও আকুল প্রাণ কতদূর আশ্বস্ত হইল তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসাধ্য।

১২৯১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে সপরিবারে আমাকে লইয়া ঢাকা গেলেন, আমি তথায় হ্যানিমান মেডিকেল স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম, পিতৃদেব কিছুদিন ঢাকা থাকিয়া তাঁহার শিষ্যদিগের আহ্বানে একাই কলিকাতা চলিয়া গেলেন। আশ্বিন মাসে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ঢাকা আসিয়া আমাদের সকলকে লইয়া পুনরায় বাড়ী আসিলেন। পূজার বন্ধের পর আমাকে একাই ঢাকা যাইতে বলিলেন। অতিশয় ভীত মনে এবার একাই ঢাকা গেলাম কিন্তু এই আপাততঃ প্রতিকূল ব্যাপার জীবনে এক নূতন অবস্থা আনয়ন করিল। চিরশান্তির সোপানে একপদ অগ্রসর হইয়া মোহ কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া সত্যের আলোক রেখা মনাকাশে ঈষৎ প্রকাশিত হইল। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুভয়ে আকুল মন পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সর্ব্বদা চিন্তাকুল, এই অবস্থায় হ্যানিমান মেডিকেল স্কুলের অপর শিক্ষক শ্রী কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিবস আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ভগবদ্‌গীতা পড়িয়াছেন কি?" আমি বলিলাম 'না' তৎপর একখানা গীতা আমার হাতে দিয়া তাহা পড়িতে বলিলেন। আমি বইখানা হাতে করিয়া বাড়ী আসিয়া প্রত্যহ রাত্রে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এবং এই হইতে জীবনে এক নূতন ভাবান্তর উপস্থিত হইল, গীতার মধ্য দিয়া পিতৃবাক্যের তাৎপর্য্য কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। অন্ধকারময় জীবন পথ কিছু কিছু আলোকিত বোধ হইতে লাগিল। অনন্ত সর্ব্বব্যাপী মঙ্গলময় সর্ব্বঘটে লীলাকারী বিধাতার বিকাশ পিতৃদেবের মধ্যে কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। জীবনের ভার ক্রমে পিতৃচরণে অর্পিত হইতে আরম্ভ হইল। ১২৯৩ সন পর্য্যন্ত ঢাকা শিক্ষকতা কার্য্যে থাকিয়া ১২৯৪ সনের প্রথম হইতে পুনরায় বাড়ী আসিয়া বসিলাম। ১২৯৪ সন হইতে ১৩০৬ সন পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর কাল পিতৃচরণে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ যাহা যাহা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহাই লিখিত হইল।

১। আপামর সকলকে সমভাবে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন, কাহাকেও দোষী কিংবা ঘৃণিত মনে করিয়া কখনও পরিত্যাগ করিতে দেখি নাই। লোক সমাজে জাতিগতভাবে কিংবা ঘৃণিত কার্য্যাদি দ্বারা অথবা রোগ দ্বারা গলিত ও দুর্গন্ধময় দেহ যুক্ত হওয়ায় যাহারা পরিত্যক্ত ছিল, তিনি সর্ব্বদা ঐরূপ লোক সকল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। আমি ঐ সময়ে ভক্তগণের সঙ্গে কিছু কিছু মিশিতে আরম্ভ করিয়াছি। পৃথকভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি সকলেই এই কথা বলে "তিনি আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন।"

২। আমানুষিক কার্য্যপটুতা দেখিয়া সময় সময় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। চতুর্দ্দিক হইতে শত শত চিঠি এবং লোক প্রত্যহ

উপস্থিত হইতেছে, সকলের চিঠির এবং কথার উত্তর দানে শান্তিবিধান করিতেন এবং এই সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত উপাসনা, কীর্ত্তন ও পাঠাদি যথাসময়ে সর্ব্বদাই হইত। চিঠি দ্বারা কিংবা সাক্ষাতে উপস্থিত সকল লোকের নাম ধাম এক বহিতে লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর সেই বহিতে দশ সহস্রেরও অধিক লোকের নাম লিখিত দেখিয়াছি। লীলার শেষ ১৩ বৎসরের মধ্যে অনেক দেশও পর্য্যটন করিয়াছেন, শিষ্যগণ দ্বারা আহূত হইয়া কলিকাতা, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান এবং তীর্থ দর্শনাভিপ্রায়ে বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কুম্ভক মেলা ও পশ্চিম সমুদ্রের পার দ্বারকাধাম পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

১৩০০ সনের বৈশাখ মাসে পিতামহী ঠাকুরাণী ঁকাশীধামে ভবলীলা সম্বরণ করেন। বাড়ীতে ঐ সংবাদ পাইয়া হিন্দুধর্ম্মমতে তাঁহার শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে পিতৃদেব আমাকে আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা মতে দেশের পণ্ডিতগণকে এবং গ্রামের ছোট বড় সকল জাতীয় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান হইল ও শাস্ত্রবিধিমত বৃষোৎসর্গ করিয়া একজন জ্ঞাতি দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল।

১৩০১ সনে এক দিবস বাড়ীর উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে ঘোর জঙ্গলময় স্থানে এক আম্রবৃক্ষতলে যাইয়া বসিলেন। আমি তাহা দেখিয়া দুইখানা ঢেউ টিন দিয়া বৃষ্টি নিবারণের জন্য ছায়া করিয়া দিলাম। কিছুদিন রাত্রে বাড়ী আসিয়া নিদ্রা করিতেন। ঐ স্থানে যাওয়ার পর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই লোক-পদ-দলনে সমস্ত জঙ্গল ভূমিসাৎ হইয়া গেল। লোক সকলকে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটা তাঁবু টাঙ্গান হইল, এবং ক্রমে দুই খানা ঘর তথায় হইল। ঘর হওয়ার পর আর রাত্রে বাড়ী আসিয়া শয়ন করিতেন না। কখনো কখনো বাহির বাটীস্থ তাঁহার বসিবার কোঠায় আসিয়া বসিতেন এবং ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত উপাসনা করিতেন। গাছতলায় সর্ব্বদাই যজ্ঞাদি হইত। কয়েকদিন পর্য্যন্ত যজ্ঞাগ্নি কখনো নির্ব্বাপিত হয় নাই। প্রায় সর্ব্বদাই রাত্রে গাছতলায় পুরাণ পাঠ ও প্লেঞ্চেট যোগে দেবতা ও মহাপুরুষগণের সহিত কথোপকথন হইত। সেই সময়ে ময়মনসিংহ নিবাসী দ্বারকানাথ দত্ত, ফরিদপুর নিবাসী প্রিয়নাথ দত্ত এবং ত্রিপুরান্তর্গত বরদাখাত সাতমোড়া নিবাসী মনোমোহন দত্ত এই কয় জন যুবক তাঁহার নিকট নিয়ত বাস করিতেন। গাছতলা যাওয়ার কিছুদিন পর হইতেই সময় সময় শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, "আমাদিগকে আর অনেক দিন দেখিতে পাইবে না এইখানেই অদৃশ্য হইয়া থাকিব।" কেহ কেহ এই বাক্যে অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে বলিতেন "দেখিবে না, কোন কোন সময় দেখিতে পাইবে।"

১৩০৭ সনের বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে পিতৃদেব জনৈক শিষ্যের আহ্বানে চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠা ভগিনী ও ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত তৎকালে চট্টগ্রামেই ছিলেন। বাড়ী হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা উভয়েই জ্বর রোগে পীড়িত বলিয়া পিতা জানিতে পারিয়াছিলেন। দ্বিজদাস দত্ত চট্টগ্রাম কলেজের Principal ছিলেন। চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় মাতা ঠাকুরাণীও গিয়াছিলেন। কিছুদিন স্বীয় জামাতার বাসায় অবস্থিতি করিয়া রুগ্ন কন্যা জামাতা এবং তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিতে প্রায় ৮ জন রুগ্ন ব্যক্তিসহ বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে বাড়ী পৌঁছিয়াছিলেন। বাড়ী পৌঁছিবার ৪/৫ দিবস পরেই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম কি দ্বিতীয় দিবসে বাবার জ্বর হয়। জ্বর সবিরাম ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রত্যহই জ্বর একবার করিয়া প্রকাশ পাইত। জ্বরের সময় গাঢ় নিদ্রাভিভূতের ন্যায় থাকিতেন। কোন প্রকার যাতনা অনুভব করিতেছেন বলিয়া বুঝা যাইত না। ঐ সময়ে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িতেন। জ্বরান্তে সুস্থ লোকের ন্যায় সমস্ত বাড়ী বেড়াইয়া অপর রুগ্ন সকলকে দেখিতেন ও শান্তি দিতেন। বাবার জ্বর প্রকাশ পাওয়ার তিন দিবস পর মাতা ঠাকুরাণীও প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। মা'ও বাবার মত রোগ যাতনার কোন ভাব বাক্যে বা মুখশ্রীতে ব্যক্ত করেন নাই; কিন্তু মাতা ঠাকুরাণী জ্বর প্রকাশের পর হইতেই প্রায় শায়িত থাকিতেন। বাবা কেবল শেষ তিন দিবস শয্যায় আবদ্ধ ছিলেন, তৎপূর্ব্বে সর্ব্বদাই বাড়ীর সকলের নিকট যাইতেন ও রুগ্ন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান করিতেন। লীলা সংবরণের দিবস প্রবল জ্বরের অবস্থায় মূত্র ত্যাগের আবশ্যকতা জানাইয়া উঠাইয়া বসাইতে বলিলেন। ধরিয়া বসাইবা মাত্রই ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া পড়িলেন। ইহা

দেখিয়া ভগ্নী শ্রীমতী মুক্তকেশী অধীরা হইয়া পড়িল দেখিয়া তাহাকে বলিলেন "ভয় কি মা মহাসমাধি।" জ্বরের সময় গাঢ় নিদ্রাভিভূতের ন্যায় থাকিয়াও শিষ্যগণের মধ্যে যে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে সর্ব্বদর্শী ভাবে তৎসমুদায়ের প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন, কেহই শান্তিলাভে বিমুখ হয় নাই। জ্বরের ১০৫ ডিগ্রি উত্তাপের সময়ও সম্পূর্ণ যোগযুক্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেন। পিতৃদেব ১৩০৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশ দিবসে রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় এবং মাতা ঠাকুরাণী দুই দিবস পরে অর্থাৎ ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বাহ্য ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

পিতৃদেবের শিষ্যগণের মধ্যে প্রায় পৌণে ষোল আনা লোক তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া কেহবা ঐশ্বর্য্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় এবং অনেকেই ঐ ঐশ্বর্য্য-বলে স্বীয় রোগ শোকাদি দমনের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, কিন্তু অতি অল্প লোকেই তাঁহার মাধুর্য্যভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া আমার মনে উপলব্ধি হইতেছে, কিন্তু তাঁহার জীবন মাধুর্য্যভাবে পূর্ণ ছিল। এ স্থলে সংক্ষেপে দুই চারিটি উক্ত ভাবের ঘটনা মাত্র উল্লেখ করিব। গলিত দুর্গন্ধময় দেহযুক্ত যে সকল লোক তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিত তাহাদের পরিচর্য্যা নিজেই করিতেন এবং নিজের শয়ন কক্ষে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে রাখিতেন, অপর শিষ্য বা পরিবারের লোকের যাহাতে কোন কষ্ট না হয় তাহাই করিতেন। চট্টগ্রাম নিবাসী ৺পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গলিত কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়া প্রায় ৫ বৎসর এখানে ছিলেন। শেষাবস্থায় পদদ্বয় হইতে দুর্গন্ধময় পূঁজ নিসৃত হওয়ায় মানুষের তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া কষ্টজনক হইয়াছিল। ঐ অবস্থায় এক দিবস আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী মুক্তকেশীকে দেখিয়া ৺পূর্ণ চক্রবর্ত্তী কিছু চিঁড়ার মণ্ড খাইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। শ্রীমতী ভগ্নী চক্রবর্ত্তীর দীনতা দর্শনে বিগলিতা হইয়া অতি যত্নে কিছু চিঁড়ার মণ্ড প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিল। বাহির বাটির দক্ষিণের ভিটার ঘরে ৺পূর্ণ চক্রবর্ত্তী এবং আর একটি কুষ্ঠগ্রস্ত স্ত্রীলোক বাস করিত। মুক্তকেশী ঐ গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইতেই বাবা তাহাকে দেখিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে নিকটবর্ত্তী হওতঃ মণ্ডের পাত্র তাহার হাত হইতে লইয়া বলিলেন "তোমার আবশ্যক নাই আমি খাওয়াইব তুমি চলিয়া যাও" এই বলিয়া পাত্র হস্তে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভগ্নী চলিয়া না যাইয়া আড়াল হইতে অলক্ষিতভাবে দেখিতে লাগিলেন, ৺পূর্ণ চক্রবর্ত্তী মণ্ড ভোজনান্তে বাবার দক্ষিণ পায়ে ধরিয়া তাহার সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ পূঁজময় ক্ষতস্থান সকলে বুলাইতে লাগিল, তিনি কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ করিলেন না এবং পা না ধুইয়াই নিজ আসনে যাইয়া বসিলেন। ইব্রাহিমপুর গ্রাম নিবাসী শ্রী আনন্দ চন্দ্র দে অতি দুর্গন্ধময় চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইয়া বৎসরাধিককাল বাবার নিকট অবস্থিতি করিয়াছিল। নিজ শয়ন কক্ষের পার্শ্বেই তাহাকে রাখিয়াছিলেন। দুর্গন্ধে কেহ নিকটে যাইতে পারিত না, তাঁহার নিকট উপস্থিত লোক সকল মধ্যে কখনও কাহাকে দোষী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন নাই ও সকলকে সমভাবে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। যত লোককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি, সকলেই বলিয়াছে "তিনি আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।" দীনতা ও সেবার ভাব জগতে বিশেষভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এক দিবস আমি একা তাঁহার নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ চৌকী হইতে নামিয়া তামাক সাজিতে বসিলেন। তাঁহার হাত হইতে কল্কী লইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি নিকটে বসিয়া আছি আমাকে কেন তামাক সাজিতে বলিলেন না" প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "তোমার কষ্ট হইবে।" তাঁহার একটি গানে বলিয়া গিয়াছেন " সেবাতে সেবক হয়ে লহ সেবা তুমি, লাজ নাই মুখে বল সেবক আছি আমি।" এ স্থলে তাঁহার অসীম মাধুর্য্যভাবের কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র দেওয়া হইল। যাহা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণাও করিতে পারি না, লিখিয়া প্রকাশ করা ত অনেক দূরের কথা।

কুমিল্লা
১৩১৭ বাং।

শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী।

ভূমিকা

(তৃতীয় সংস্করণ)

জগতের মধ্যে প্রত্যেক ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্য বিশ্বজনীন-সাধন-সৌকার্য্যার্থে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইতেছে এবং সর্ব্বতোভাবে সাধনার সম্যক সমাধান হইতে পারে, তজ্জন্যই সকলে নিজ নিজ ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে। একতার কার্য্য সকল ধর্ম্মের মূলেই নিহিত রহিয়াছে। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব চক্ষুষ্মান ধর্ম্মবিত-পুরুষ জানিতে পারিয়া জগতের কল্যাণোদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করেন।

আজ আমরা যে মহাপুরুষের জীবন লীলার কিঞ্চিৎ আভাস এ স্থলে প্রদান করিতেছি, তাঁহার অমানুষী ধর্ম্ম-সাধনার বিশদ ইতিহাস সময় পাইলে লিখিতে সচেষ্ট হইব। আজ সাধারণভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-মতের সমালোচনা করিব।

তিনি একজন সুশিক্ষিত এবং আদর্শ মানব ছিলেন। তাঁহার পিতা ভক্তিভাজন দেওয়ান রামদুলাল নন্দীও নিজে মহাপুরুষ ছিলেন।

এই মহাত্মার সাধন-প্রণালী তদানীন্তন শক্তি-উপাসনার অনুমত ছিল। তাঁহাকে সকলে অদ্যাপি এতদঞ্চলে সিদ্ধপুরুষ বলিয়াই মানিয়া থাকেন।

ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে দেশের জীবন-প্রবাহ পরিবর্তিত করিয়াছেন, সে দেশেই শ্রী শ্রী আনন্দ মহারাজও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

১২৩৯ বাংলা সালের ১১ বৈশাখ রবিবার তাঁহার জন্মদিন এবং ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রাম তাঁহার জন্ম ভূমি। জন্মগ্রহণ করিবার পর তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা পিতার প্রযত্নে সকল প্রকারে প্রদত্ত হইয়াছিল। বাঙ্গলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী ও পার্শী প্রভৃতি ভাষায় অধিকার তাঁহার প্রভূত পরিমাণে জন্মিয়াছিল। পারিবারিক জীবনেও তাঁহার সুবিধা অনেক ছিল। তিনি উন্নত পরিবারের লোক ছিলেন। তাঁহার পিতার জমিদারী ছিল। ত্রিপুরা রাজষ্টেটের রামদুলাল একজন ক্ষমতাশালী দেওয়ান ছিলেন।

অল্প বয়সেই শ্রীআনন্দের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হয়। বিবাহ নিয়াও মহা সমারোহ হইয়াছিল। পিতার পরলোক গমনান্তে প্রায় বিংশতি-বর্ষ-বয়ঃক্রম-সময়েই তিনি সংসার পরিচালনার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সংসারের অভাব-অভিযোগ কিছুই ছিল না, কিন্তু নানা-ঘটনা-ব্যাপদেশে কাল-স্রোতে পড়িয়া তিনি অচিরকালমধ্যে ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়েন। ঋণ-পরিশোধ-করণোদ্দেশ্য করিয়াই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ স্বর্গীয় কালীনাথ নন্দী মহাশয়ের সহিত পর্ব্বতে যাইয়া হাতীর খেদাও করিয়াছিলেন। কালীনাথ নন্দী সম্পর্কে তাঁহার খুড়া হইতেন। খেদায় অবস্থান-কালেই তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিয়া মূর্ত্তি-পূজার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মে। ক্রমে ১২৭৪ কিংবা ১২৭৫ সালে ঢাকা-পূর্ব্ববঙ্গ-ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহ-প্রতিষ্ঠার সময়ে যথারীতি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুসারে তিনি দীক্ষাও গ্রহণ করেন। এমন কি, ১২৭৬ বা ১২৭৭ সালের আশ্বিন মাসে নিজ বাড়ীতে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া শারদীয় দুর্গোৎসব সময়ে পূজামণ্ডপেই কালীকচ্ছে সর্ব্ব-প্রথম ব্রহ্মোৎসব করেন। অদ্যাপি উক্ত উৎসব-গৃহ "ব্রহ্মমন্দির" নামেই পরিচিত রহিয়াছে।

ব্রাহ্ম সমাজে অবস্থিতি কালেই তাঁহার নিকটে "দয়াময়" নাম প্রত্যাদেশ বাণীরূপে অবতীর্ণ হয়। তিনি এই নাম লইয়াই সাধন করিয়া উত্তর কালে "সর্ব্ব ধর্ম্ম" প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীই "প্রকৃত তত্ত্ব"-এ বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা অথবা ভাবের ব্যতিক্রম স্থলবিশেষে হইয়া থাকিলে তজ্জন্য তৎশিষ্য সর্ব্বসাধক পরলোকগত কামিনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ই দায়ী। কারণ, তিনিই শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজের নিকট শুনিয়া সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রয়োজন সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন ঃ—

"এই পঞ্চপঞ্চাশৎটি বিষয় জগতের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সন্দেহ নিরাকরণার্থে যতই উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইবে, ততই সাধ্যসাধনার

যোগ মনুষ্য-মনে প্রকাশিত হইয়া, জীবন সংশোধন করতঃ ধর্ম্ম-জীবনে পরিণত করিবে— এই ধারণা আমার মনে প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে। যদি কেহ সরল বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এতদ্বিরুদ্ধে কোন অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কিংবা পত্র দ্বারা তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলে আমি তাহা খণ্ডন বিষয়ে চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প রহিলাম।"

শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ চন্দ্র নন্দী আচার্য্য মহারাজের জীবনের কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস প্রণীত হয় নাই। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত একটি ক্ষুদ্র জীবনী (autobiography) আছে। তাহা পাঠ করিলে ১২৭৮ কিংবা ১২৭৯ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সাধারণ বিবরণ জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর কোন জীবন-বৃত্তান্ত কোথাও লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় নাই। তৎপ্রণীত দুইটি সঙ্গীত পুস্তক আছে। উক্ত পুস্তক দুইটি ব্যতীত "যোগ প্রণালী" নামে প্রকাশিত একটি অতি ক্ষুদ্র সাধনার বইও রহিয়াছে। এ-ছাড়া অতি বড় একখানা উপাসনার বিবরণী গ্রন্থ আছে। উহার নাম "সর্ব্বধর্ম্ম সাধনতত্ত্ব ও প্রণালী"। আজও ইহা প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থখানার পত্রে পত্রে তাঁহার প্রবর্ত্তিত "সর্ব্ব ধর্ম্ম"-এর অতিশয় জটিল ও উপাদেয়, সাধন-লব্ধ তত্ত্ব ও প্রণালী— সমস্ত বিষয় তিনি সকলের সুবিধার নিমিত্ত সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি কি অসীম ধৈর্য্য ও শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মের নাম "সর্ব্ব ধর্ম্ম"। এই ধর্মের সহিত সকল ধর্ম্মেরই সম্যক্ সংযোগ রহিয়াছে, এবং সকল ধর্ম্মই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পৃথিবী ও পরলোকবাসী মানব ও দেবতা—সকলের জীবন-মুক্তির সাধন পূর্ণ করিবে।

আচার্য্য মহারাজ ১৩০৭ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পরলোক গমন করেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতেই "সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন" স্থাপন করিয়াছি। যে ধর্ম্ম দ্বারা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একতার কার্য্য সংসাধিত হইবে এবং মানুষ ও দেবতা মিলিয়া একত্র কার্য্য করিবে, সে ধর্ম্ম প্রচার করা যে সকলেরই ঈপ্সিত বিষয় এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তদ্‌বিষয়ে "দয়াময়" নামই আমাদের একমাত্র অবলম্বন এবং যিনি এ ধর্ম্ম-মহীরুহ প্রতিষ্ঠার জন্য ধরাতলে আসিয়াছিলেন, তাঁহার করুণাই আমাদের জীবনমন্ত্র। আশা করি, সকলের আশীর্ব্বাদে আমাদের দুস্তর পথ সুগম হইবে এবং সর্ব্বপ্রকারে এই মিশন স্বীয় ব্রত-উদ্‌যাপনে সমর্থ হইবে।

"সর্ব্ব ধর্ম্মের সারকথা", "সর্ব্ব ধর্ম্মের সাধনা", "সর্ব্ব ধর্ম্মের সেবা" ও "শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ"—নামক গ্রন্থ চারিখানা প্রকাশিত হইলে এই ধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ সকলেই জানিতে পারিবেন।

"প্রকৃত তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে ৫৫টি তত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। এই সমস্ত তত্ত্ব সম্পর্কে অনেকে সন্দিহান হইতে পারেন; কিন্তু "দয়াময়" নামের সাধন সর্ব্ব-যোগে আবির্ভূত হইলে কেহই উক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুমাত্র সংশয় আর পোষণ করিতে পারিবেন না। ইহার প্রমাণ আমাদের মধ্যে অনেকেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছে।

আচার্য্য মহারাজ বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতেই "সর্ব্ব ধর্ম্ম"-এর সার-সত্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে ঃ—

মনোহরসাই— একতালা

ভয় নাই আর সংসারে, দয়াল নাম সাধরে।
জীবের পরিত্রাণ, শুভ বিধান, দয়াময় রূপ সাগরে।
মধুর প্রেমের ধন, দয়াময় কর মনন, হৃদয় শুদ্ধ হবে অচিরে,
দেখ যাবে ব্যাধি, হবে সিদ্ধি, মৃত্যু ক্ষয় হবে শরীরে।
শিব শুক নারদাদি, পায় নাই কেউ জীবনের বিধি,
বিধি বিষ্ণু সব যম করে,
এখন অবতীর্ণ মৃত্যু শূন্য, দয়াময় রাজ্য বিস্তারে।

—নিবেদক—
শ্রী লবচন্দ্র পাল।

সর্ব ধর্ম্ম মিশন
উজানচর, ত্রিপুরা,
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি,
মঙ্গলবার, ২৯শে পৌষ, ১৩৪২ সাল।
আনন্দাব্দ-১০৪।

ভূমিকা

(ষষ্ঠ সংস্করণ)

সর্ব্বধর্ম্মাবতার শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামী জগতকে মুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "প্রকৃত তত্ত্ব"-ই সর্ব্বধর্ম্মের মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি যে পঞ্চপঞ্চাশৎটি তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন, এই সকল তত্ত্বকে সর্ব্বধর্ম্মের মূল সূত্র বলা যাইতে পারে। এই সকল তত্ত্ব নিয়াই সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ১২৯০ বাংলা সনে শ্রীআনন্দের জীবদ্দশাতেই এই গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়। তৎপর ১৩৫৫ বাংলা সনে সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন কর্তৃক দ্বিতীয়বার এই গ্রন্থখানা বাহির হয়। পঞ্চম সংস্করণের সমস্ত গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়ায় এক্ষণে মিশন হইতে আবার ষষ্ঠ সংস্করণ বাহির করা হইল।

শ্রীআনন্দ বলিয়াছেন, "এই পঞ্চপঞ্চাশৎটি বিষয় জগতের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সন্দেহ নিরাকরণার্থে যতই উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইবে, ততই সাধ্যসাধনার যোগ মনুষ্য মনে প্রকাশিত হইয়া, জীবন সংশোধন করতঃ ধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিবে– এই ধারণা আমার মনে প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে। যদি কেহ সরল বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এতদ্বিরুদ্ধে কোন অকাট্ট যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন তবে আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কিংবা পত্র দ্বারা তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলে আমি তাহা খণ্ডন বিষয়ে চেষ্টা করিতে কৃত সংকল্প রহিলাম।"

সর্ব্বধর্ম্মের যতই প্রচার বৃদ্ধি পাইতেছে ততই বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থের চাহিদা বাড়িতেছে। জগত যতই ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে ততই "প্রকৃত তত্ত্ব"-এর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জটিল তত্ত্ব সমূহ সর্ব্বধর্ম্মার্থীগণের বোধগম্য হইবে।

শ্রীআনন্দ বলিয়াছেন, "জগতের জাতিগত পার্থক্য এবং ধর্ম্মগত অনৈক্যের অবসান না হইলে কেহই একতার পূর্ণযোগ লাভ করিয়া জীবন-মুক্তির সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে না।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া সস্ত্রীক দয়াময় নাম সাধন করিলে সংসারে স্বর্গ নামিয়া আসিবে। পরলোকবাসী নর-নারী এবং দেবতা সকল প্রভেদ ভুলিয়া ইহলোকে আসিয়া দয়াময় নামে মাতোয়ারা হইয়া প্রেমযোগে মিলিত হইবে– ইহাই জীবন-মুক্তির সোপান।"

তাঁহার আরও উক্তি আছে– "প্রকৃত বিবাহ শরীরেতে কার্য্য না করিলে সাধনের শেষ ফল লাভ করিতে পারিবে না। সকল মৃত মনুষ্য পূর্ব শরীর লইয়া আবার পৃথিবীতে আসিয়া শরীর সাধন পূর্ণ করিবে এবং অমরত্ব লাভ করিবে।" সর্বশেষে তিনি বলিয়াছেন, "সর্ব্বপ্রকারের পার্থক্য দূর করিয়া দয়াময় নাম সাধন করিলে রোগ, শোক, মৃত্যু হইতে নির্ভয় ও জীবন-মুক্ত হইবে।" আশা করি সাধন প্রয়াসীর জীবনে এই অমূল্য গ্রন্থখানা অমৃত তত্ত্ব দান করিবে।

শ্রীকামিনী কুমার দত্ত মজুমদার।

ভোলাচং মিশন বাড়ী,
১০ই আশ্বিন, ১৪০০ বাংলা।

প্রকৃত তত্ত্ব

শ্রীশ্রীমদাচার্য্য আনন্দস্বামী

প্রকৃত তত্ত্ব

ধর্ম্মবীজ

১। ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ
তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ তদেব সর্ব্বশক্তিমৎ।

এক পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য আর কিছুই ছিল না; ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালে একমাত্র তাঁহারই সত্ত্বাতে কারণ এবং কার্য্য উভয় নিহিত। তাঁহারই ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে এবং সকল শক্তিই তাঁহার। পূর্ণ অথবা আংশিক শক্তিশালী আর কোন ব্যক্তির অস্তিত্বই নাই।

আত্মা এবং শরীর এক

২। আত্মা এবং শরীর উভয়ই এক এবং ব্রহ্মভূত পদার্থ। সিদ্ধ ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। শরীর আত্মাতে কার্য্য করিতেছে ও আত্মা শরীরে কার্য্য করিতেছে ও ভূত সকল একে অন্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরমাত্মার বিবিধ শক্তিযোগে জগতের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। উভয় এক মূল হইতে উদ্ভব না হইলে এইরূপ ঐক্য ভাবের কার্য্য হইতে পারে না। প্রকার ভেদ হইলেও এক মূল হইতে উৎপন্ন দুই বস্তু বস্তুতঃ এক।

মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন

৩। অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইতে সৃষ্ট মনুষ্য নানাপ্রকার কার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতেছে। দুইটি ব্যক্তির মধ্যেও এক প্রকার কার্য্য ও সর্ব্ব বিষয়ে এক প্রকার ভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই পার্থক্য আবার প্রত্যেকের জীবনের উন্নতির ব্যাপার। কারণ এই যে, যাহার যেরূপে কার্য্য করিয়া ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃত পথ লাভ করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যাহা হইতেছে তাহা স্বতঃই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টের প্রমাণ। প্রত্যেক কার্য্যের মূলে বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় রহিয়াছে। নিয়ন্তার অভিপ্রায় কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না, কাজেই সেই অভিপ্রায়ানুসারে মনুষ্য কার্য্য করিতে বাধ্য।

শুভাশুভ উভয়ই মঙ্গল

৪। যখন এক নির্দ্দিষ্ট মঙ্গল ইচ্ছার অধীন হইয়া এই জগৎ শুভাশুভ অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে, ও প্রত্যেক অশুভ, শুভযোগ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বকার্য্য বলিয়া স্বীকার্য্য হইতেছে ও উভয়ই একটি মঙ্গলের প্রস্রবণ হইতে প্রবাহিত, তখন শুভাশুভ উভয়ই মঙ্গলের কার্য্য, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই

৫। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কিছুই থাকিতে পারে না। সময়ে সম্পূর্ণরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় একথা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। কাহারও

নিরাশ হইবার অধিকার নাই। সকলেরই আশা পূর্ণ হইবে, একথা ধ্রুব সত্য। যিনি আশা দিলেন, আশা পূরণ করাও তাঁহারই সঙ্কল্প।

সাম্প্রদায়িকতা

৬। জগতের কোন ধর্ম্মকেই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। কেননা তাহা সাময়িক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়। কেহই সরল বিশ্বাস ভিন্ন, কৈতবযুক্ত হৃদয় লইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই এবং যাঁহারা সেই প্রচারানুযায়ী কার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাই এক এক সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়াছেন। এই সাম্প্রদায়িকতা ধর্ম্ম জীবনের শৈশবাবস্থা, তাহা হইতে মনের বিরাগ পৌঢ়াবস্থা, এবং তাহা সম্যকরূপে পরিত্যাগ সৎ এবং সিদ্ধাবস্থা।

কেমন ব্যক্তি গুরু হইতে পারে

৭। সর্ব্ব ধর্ম্মের সামঞ্জস্য যেখানে, সেখানেই প্রকৃত ধর্ম্ম। এইজন্য ঈশ্বর হইতে সর্ব্বতত্ত্ব লাভ করিয়া, যে ব্যক্তি সকল ধর্ম্মের ঐক্যে যোগ দিয়া লোকদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম সাধনের পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম, তাঁহাকেই গুরু বলা যাইতে পারে।

সাধুসঙ্গ ও গুরু পরিচয়

৮। সাধুসঙ্গ রূপ তরঙ্গে যে ব্যক্তি একবার পড়িয়াছে, তাহার জীবন সংশোধনের বিশেষ উপায় উপস্থিত হইয়াছে। সাধুসঙ্গ দ্বারা হৃদয় পরিষ্কার হয়, মন প্রশান্ত হয় এবং সাধ্য-সাধনার বিশেষ যোগ লাভ হইতে থাকে; বিশেষতঃ সাধুসঙ্গ দ্বারা জীবনের অংশ ঈশ্বরেতে অর্পণ করিয়া গুরুরূপী সাধুর পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

সকলই পবিত্র

৯। পবিত্র স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের রাজ্যে অপবিত্র কিছুই হইতে পারে না, কেবল মনের ভাব এবং প্রকৃতির অধীন হইয়া মনুষ্য 'পাক নাপাক' পবিত্রতা ও অপবিত্রতার বিচার করিয়া থাকে। বাস্তবিক সকলই পবিত্র, অপবিত্র কিছুই নাই। এইজন্যই জ্ঞানযোগে পঙ্কচন্দনের তুল্যত্ব শাস্ত্রদিতে লিখিত হইয়াছে।

স্বর্গ ও নরক

১০। স্বর্গ ও নরক নামে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। মৃত্যুর পর নিজ কার্য্যানুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ধারণাও অলীক; কেননা শরীরের সঙ্গেই শুভাশুভাদির উৎপত্তি এবং তাহার সঙ্গেই নাশ। শরীর ধ্বংস হইলে শুভ আর অশুভ উভয়েরই আধার নষ্ট হইয়া যায়। স্বর্গ শব্দের অর্থ সুখ, স্বর্গের

ভাব যাহা পূরাণাদিতে পাওয়া যায়, তদনুসারে সুখময়ই প্রতীত হয়। মনুষ্য কেবল সুখের জন্যই ব্যাকুল, এইজন্য স্বর্গের ভাবও সুখেতেই পরিবৃত হইয়াছে। বিষয়ের মধ্যে অসুবিধা উপস্থিত হইলে মানুষ দুঃখ সাগরে পতিত হইয়া যখন দয়ার সাগর ইশ্বর সমীপে ক্লেশ হইতে মুক্তির প্রার্থনা করে, তখন বিষমযোগ শীঘ্র দূর হওয়ার জন্য শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নানা প্রকার উৎপাত উপস্থিত হয়। ইহার কারণ এই যে, জীবন-মুক্তির পূর্ব্বে শরীর সাধন হইয়া ব্যাধি দূর এবং সকল প্রকার অভাবের যোগ শেষ হওয়া আবশ্যক। এই বিষমযোগ দূর হওয়ার নাম স্বর্গ ও তাহার বিপরীত ভাবের নাম নরক। সাধারণভাবে শরীর অবস্থানের সুখের অবস্থার নাম স্বর্গ ও দুঃখের অবস্থার নাম নরক বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক স্বর্গ ও নরকের কোন বিশেষ স্থান নাই। আমাদের দৈবসিক কার্য্য ও ভাবের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে স্বর্গ ও নরকের ভাব যাতায়াত করিতেছে। জীবিতাবস্থাতে প্রকৃত সুখের ভাব ও ক্লেশের নিবৃত্তি না দেখিয়া মনুষ্যের মৃত্যুর পর সম্পদ অথবা বিপদের দিন আসিবে, এই বিশ্বাস পূর্ব্বকালের সাধকদিকের মনে স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে সেই ভাবী সুখ ও দুঃখকেই তাঁহারা স্বর্গ ও নরক নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

জন্ম একবার

১১। এই জগত একবার সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপেই উন্নতভাবে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। সর্ব্বশক্তিমৎ ঈশ্বরের কার্য্য কখনই বৃথা ও অসিদ্ধ হইতে পারে না। একবার প্রয়োজনের অভাব হইলে অদৃশ্য হয়, আবার প্রয়োজনানুসারে আবির্ভূত হয় এইমাত্র। এই নিয়ম অদ্যাপি আধ্যাত্মিক ভাবে জগতের অন্তরস্থ আছে, বাহ্য

জগতে প্রকাশিত হয় নাই। একজনের মৃত্যুতে যে সকল আত্মীয়বর্গের শোক উপস্থিত হয় ও যে সকল ব্যক্তি কোন একটি সাংসারিক দুঃখ হৃদয়ে লইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় তাহাদের উক্ত শোক ও দুঃখ দূর হওয়া আবশ্যক। দুঃখের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা ও সুখের প্রতি স্পৃহা দেখা যায়, অথচ দুঃখ ও সুখ উভয়ই অনুভূত, এইজন্য দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া সুখের ভাবই মনুষ্যেতে থাকিবে এবং প্রত্যেকেরই জীবন-মুক্তি ও অভাব মোচন হইয়া আশার নিবৃত্তি হইবে, এই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। পুনর্ব্বার জন্ম হইলে, পূর্ব্ব জন্ম সম্পর্কে সকল কার্য্য পন্ড হইয়া যায়। অতএব যাহার শরীর ধ্বংস হইতে দেখা যায় সে পূনর্ব্বার অন্য আকৃতি ধারণে শিশু হইয়া না জন্মিয়া সেই শরীর লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়া পূর্ব্ব পরিচিতের নিকটে পরিচিত হইবে ও সকল শোক দুঃখের শেষ করিবে ইহাতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। মঙ্গলময়ের রাজ্যে এমন দিন অবশ্যই আসিবে যে দিনে প্রত্যেক মৃত মনুষ্য পূর্ব্ব শরীর লইয়া পৃথিবীতে আসিয়া শরীর ধারণের প্রকৃত ফল জীবন-মুক্তি লাভে দয়াময়ের পূর্ণ মঙ্গল ভাবের পরিচয় প্রদান করিবে।

বন্ধু বিয়োগের পরকার্য্য

১২। শোক নিবারণার্থ শ্রাদ্ধাদি অপ্রয়োজনীয়, কেননা তাহাতে জীবন-মুক্তির আশা দূরীভূত হইয়া যায়। কেবল এই প্রার্থনা করা আবশ্যক যে মৃত ব্যক্তির জীবন সংশোধনের জন্য শরীর ধ্বংস করিয়াছ দেখিতেছি, কিন্তু তোমার মহিমাসাগরের জল-কণিকা স্বরূপ তাঁহার শরীরের অস্তিত্ব তোমাতেই আছে। তুমি ইচ্ছা করিলে, যে সময়ে ইচ্ছা তাঁহার শরীর আমাদের নিকট আনয়ন করিতে পার। এইজন্য এই ভিক্ষা চাই, তাঁহার জীবন-মুক্তি সম্বন্ধে তোমার যাহা ইচ্ছা

তাহা সম্পন্ন হউক ; এবং বন্ধুবান্ধবদিগের মনের শোক তাঁহার পুনরাগমনজনিত আশা দানে দূর করিয়া কৃতার্থ কর।

যে বস্তু অথবা ব্যক্তি দ্বারা শোক ও দুঃখের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, সে সকলের দ্বারাই আবার তাহা নিবারিত হইবে

১৩। ভাব অভাব, সুখ দুঃখ, চাঞ্চল্য স্থিরতা, সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতাদি সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মনুষ্য মনে বিচরণ করিতেছে। এসকল কেহ ইচ্ছা করিয়া আনয়ন, পোষণ অথবা দূরীকরণে সমর্থ নহে। কেবল একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটিতেছে। যে সকল অভাব সময়ে সময়ে স্মরণ হইয়া দুঃখ উৎপাদন করিতেছে, কোন প্রকারেই আত্ম ইচ্ছাতে তাহা হৃদয় হইতে দূর করা যাইতে পারে না। পুত্র ও বিত্তাদির শোক, আর একটি পুত্র অথবা বিত্ত লাভে কথঞ্চিৎ দূর হইতে পারে। কিন্তু মৃতপুত্র ও বিগতবৈভব স্মরণ হইবামাত্র ঐ শোক পুনর্ব্বার উথলিয়া উঠে। মঙ্গলময়ের রাজ্যে লোকের এই প্রকার শোকের ভাব চিরকাল থাকিতে পারে না। এস্থলে ইহাই অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যে বস্তু কিংবা বিষয় অথবা ব্যক্তির দ্বারা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইয়াছে সেই বস্তু কিংবা বিষয় অথবা ব্যক্তির দ্বারাই সেই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে এই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কোন প্রকারের খেদ মনে থাকিয়া গেলে মানুষের জীবন-মুক্তি হইতে পারে না।

প্রতিকূল ও অনুকূল ব্যাপারের একতা দ্বারা সিদ্ধিযোগ উপস্থিত হইবে

১৪। যেমন অন্ধকার ও আলোক, রাত্রি ও দিবা রূপে জগতে বিদ্যমান আছে, সেইরূপ সুখ দু'খ, ভাব অভাব, আশা নিরাশা প্রভৃতি অনুকূল ও প্রতিকূল ব্যাপার জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্ধকার না থাকিলে আলোকের গৌরব, দুঃখ না থাকিলে সুখের গৌরব, অভাব না থাকিলে ভাবের গৌরব মনে আসিতে পারে না, এইজন্য একের সহিত অন্যের বিপরীত সম্বন্ধ থাকিলেও একের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের অস্তিত্ব স্থিরতর হইয়া রহিয়াছে, ও উভয়ের মধ্যেই সমভাবে মঙ্গলের ভাব বর্ত্তমান আছে। প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে যে মঙ্গলের ভাব আছে তাহা সাধারণ মনুষ্যের প্রতীতিজনক হয় না, কেননা তাহা ইচ্ছার বিরোধী ও দুঃখজনক। কিন্তু যেমন অন্ধকার গর্ভে এই প্রকাশ্য দৃশ্যমান জগৎ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যেও অনুকূল ভাব বর্ত্তমান আছে। এইজন্য অনুকূল ও প্রতিকূল ব্যাপার উভয় একযোগেই অবস্থিতি করিতেছে। একের অভাবেতে অন্যের অভাব ও একের সদ্ভাবেতে অন্যের সদ্ভাব অতর্কিত। বাস্তবিক উভয়ই এক এবং একদিকেই প্রবাহিত হইতেছে। এই উভয়ের মিলিত ভাব হৃদয়ে স্থির হইলে সিদ্ধযোগ লাভ হয়। এই সিদ্ধযোগ একদিন প্রকাশিত হইয়া মনুষ্যকে পরমানন্দ দান করিবে, এই আশা হৃদয়ে থাকিলেও শান্তি লাভ হয়। জ্ঞানীরা এই আশাতেই হৃদয়ে প্রসন্নতা লাভ করিতেছেন।

আমি তুমি ঐক্যতার বিরোধী

১৫। অহঙ্কার অর্থাৎ আমিত্ব রূপ বন্ধনে জীব সকল আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেকের এক একটি পৃথক অস্তিত্ব, মনের এই ধারণা। আমার স্বার্থ আমার রক্ষা আবশ্যক ও তোমার স্বত্বের জন্য তোমার সংগ্রাম করা প্রয়োজনীয়। আমি ও তুমি কর্ত্তৃত্ব যোগে অবস্থিতি করিতেছি, আমাদের কার্য্যের ফল আমরা ভোগ করিতেছি ও তদনুসারে আমরা ভাল ও মন্দ রূপে লোকেতে জানিত হইতেছি। প্রত্যুত এই সকল ভাব - আমি তুমি এই দুই বাক্যের মধ্যে সাধারণতঃ যেভাবে বিচরণ করিতেছে তাহা ঐক্য ভাবের বিরোধী। বাস্তবিক আমি যাহা তুমিও তাহা, এই সমভাব জ্ঞানযোগেতে স্থিরতর হয় এবং প্রেমযোগেতে কার্য্যে পরিণত হয়। যেকাল পর্য্যন্ত মানুষকে দোষী ও গুণী বলিয়া মনে ধারণা থাকিবে ততকাল জগতে ঐক্য বন্ধন অসম্ভব। সে দিন আসিতেছে, যে দিনে অদ্বৈত ভাবাপন্ন জ্ঞানী মানুষের চীৎকারধ্বনি সফলতা লাভ করিবে। অদ্বৈতভাব ব্যতীত আর কোন প্রকারেই মানুষের প্রতি মানুষের মন্দভাব দূর হইতে পারে না।

লৌকিক ও অলৌকিক ব্যাপার উভয় একই শক্তির পরিচয় দিতেছে

১৬। যাহা সাধারণতঃ ঘটে না তাহাকেই অলৌকিক ব্যাপার বলা যায়। অলৌকিক ব্যাপার সচরাচর ঘটে না বলিয়াই ইহাতে মনুষ্য-মনের আশ্চর্য্য উৎপাদন করে, ও লৌকিক ব্যাপার সাধারণ বলিয়াই তদ্দ্বারা মন চমৎকৃত হয়

না। এই নিমিত্ত অসাধারণ ব্যাপার ঘটিলেই লোকের মনে ঐশী শক্তির ভাব উদয় হইয়া থাকে। ফলতঃ লৌকিক ও অলৌকিক ব্যাপার উভয়ই এক শক্তির পরিচয় দিতেছে। লৌকিক ঘটনা হইতে পারে, অলৌকিক ঘটনা হইতে পারে না, এই কথা কাহারও বলিবার অধিকার নাই' কেননা ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা সর্ব্ব বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইবেই হইবে। জ্ঞানী এই উভয় ব্যাপারকে সমভাবে দর্শন করেন। মোহ নিদ্রা হইতে মনুষ্যকে জাগরিত করিবার জন্যই সময়ে সময়ে অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

পূর্ণ সিদ্ধাবস্থা না হওয়াতে সাধকের বাক্যে ও কার্য্যে অবিশ্বাসের কারণ হয়

১৭। কোন সাধক বাক্য বা কার্য্য দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করাইলেই লোকে তাঁহাকে সিদ্ধ ব্যক্তি জ্ঞান করে। কিন্তু কোন সময়ে কোন অংশে সেইরূপ অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করাইতে ত্রুটি হইলে অর্থাৎ সেই সাধক বাক্য অথবা কার্য্যের দ্বারা লোকের যে আশ্চর্য্যভাব উৎপাদন করিয়াছিল, কোন অংশে কোন সময়ে তাঁহার মধ্যে ত্রুটি হইলে, সে আর তাহা করিতে সক্ষম নহে, এইরূপ মনে ধারণা হইয়া অনেকে সেই সাধকের কার্য্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। এইরূপ হইতে হইতে পরে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির হয় যে মনুষ্য লোকাতীত কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। তখন কোন ব্যক্তিকে ঐশী শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে

করিতে ও তাহার কোন কার্য্য দর্শন, তাহার কোন বাক্য শ্রবণ করিতেও মনের সরস ভাব হয় না। সাধকের কার্য্যে ও বাক্যে সময়ে সময়ে বিশেষ ও সময়ে সময়ে ত্রুটির ভাব তাহার সিদ্ধাসিদ্ধ অবস্থার ফল। এই অবস্থা হইতে যতই সিদ্ধাবস্থার আধিক্য ও অসিদ্ধাবস্থার ন্যূনতা হইবে ততই কার্য্য ও বাক্যের ভাব বিশেষ দর্শন হইতে থাকিবে। পূর্ণ সিদ্ধাবস্থার লোক অদ্যাপি পৃথিবীতে আগমন না করাই লোকের এই অবিশ্বাসের কারণ। এক গুরুর বাক্যে সন্দেহ করিলে অন্য গুরুর বাক্যের প্রতিও সন্দেহ হইতে পারে, ও স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া কালক্ষয় করা মাত্র - এই আশঙ্কা করিয়াই প্রাচীন হিন্দুগণ গুরুকে উপদেশের সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর জানিয়া তাঁহার বাক্যেতে অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করার ভাব লোকেতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিকূলতা ও অনুকূলতা সকলই ঈশ্বরের মধ্যে আছে

১৮। ঈশ্বর দয়াময় জগতের যন্ত্রী হইয়া মঙ্গল সাধন করিতেছেন। প্রতিকূলতা ও অনুকূলতা উভয়ই তাঁহার মঙ্গল ভাবের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু মুনষ্য অনেক সময় প্রতিকূলতা ঈশ্বরে আরোপ করিতে সন্দিহান হয়। যাহারা ঈশ্বরীয় যোগ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে কর্ত্তৃত্ব মানুষেতে নাই। ভাল মন্দ সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হইতেছে। অন্য দূরে থাকুক ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিয়াও তদনুসারে কার্য্য হইতে দেখা যায় না, অথচ সাধক যাহা শুনিতে পান তাহা ঈশ্বরবাণী বলিয়া অতর্কিত ভাবে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বরবাণীর মধ্যেও সিদ্ধকার্য্যে অগ্রসরতার পরিমাণে সত্য ভাবের আধিক্য ও অল্পতা হইয়া থাকে। যাহার নিকটে সাধক ঐ

বাণী প্রকাশ করেন, তাহার জীবনের জন্য যতদূর সত্য ও অসত্য শ্রবণ করা আবশ্যক তাহা তদ্রূপ হইয়া থাকে। সাধক ইহা জানিয়া অন্যকে, বুঝাইয়া দেওয়া অসাধ্য ভাবিয়া স্থিরচিত্তে কেবল সেই বিশেষ দিনের জন্যই অপেক্ষা করেন। কোন কোন সাধকের অনেক কথার অর্থ পর্য্যন্তও বুঝিতে পারা যায় না, - প্রলাপ বাক্য বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা সেই রাজ্যে গমন করেন নাই তাঁহারা কোন প্রকার বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে ও এই সন্দহে নিবারণ করিতে পারিবেন না।

প্রবৃত্ত, সাধক, সিদ্ধাসিদ্ধ ও সিদ্ধ

১৯। মানুষের জীবন চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা- প্রবৃত্ত, সাধক, সিদ্ধাসিদ্ধ এবং সিদ্ধ। প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে অতি শৈশব অবস্থা, যে অবস্থাতে মনুষ্য অজানিতরূপে ভাবী সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়। মনুষ্য যখন জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যগ্র হয় তখনই তাহাকে প্রবৃত্ত বলিয়া বলা যাইতে পারে। উন্নতি সাধনের পথে দন্ডায়মান হইলে সাধক বলা যায়। সাধনের অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিলে যখন সিদ্ধভাব কিয়ৎ পরিমাণে আসিয়া হৃদয় মনের শান্তি করে তখন তাহাকে সিদ্ধাসিদ্ধ বলা যায়। সাধনের শেষ হইলে অর্থাৎ যে সময়ে ঈশ্বরের সহিত বিশেষ একতা জন্মিয়া হৃদয়ের অভাব সম্যকরূপে পূর্ণ হয়, তখনই সিদ্ধ বলা যাইতে পারে। এই সিদ্ধাবস্থা লাভ করাই প্রত্যেক সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য। এমন লোক দর্শন হয় নাই যে তাহার অভাব সম্পূর্ণরূপে মোচন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেহই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। এইজন্য কেহই জগতে সর্ব্বদেশে সর্ব্বলোকের মনে নিজ নিজ সাধনলব্ধ ধর্ম্মৈশ্বর্য্য দান করিয়া গ্রহণ

করাইয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাই জগতে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার কারণ।

কোন ধর্ম্মাবলম্বী বিপথগামী নহে

২০। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কেহ বা মধ্যস্থ কোন ব্যক্তির প্রতি, কেহ বা কল্পিত কোন এক কিংবা অধিক মূর্ত্তির প্রতি, কেহ কেহ বা বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, জল, স্থল, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থ সকলের উপর, কেহ বা শুদ্ধাচার, কেহ বা অশুদ্ধাচারের উপর, কেহ বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার বাক্যের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ও কেহ বা কোন পুস্তকের লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া, পরিত্রানের আশা করিতেছে। ইহারা কেহই বিপদগামী নহে। সকলেই পথ চলিয়া যাইতেছে। যাহার যেরূপ বিশ্বাস হইতেছে তাহাই তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিতে হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার সাময়িক ও ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অধীন। প্রত্যেকে ইহার মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের পথে আসিবে ও সময়ে সকলে প্রেমযোগে মিলিত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ কিছুই নাই।

প্রচারক ও আচার্য্যের কার্য্য

২১। প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী আছে, যাহা শেষ না করিয়া মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের পথে উপনীত হইতে পারিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে

ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ বা বোধ করুক না কেন, প্রচারিত বা অপ্রচারিত, অন্য ভাবও তাহার অন্তঃকরন মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবশ্যই জানা যাইবে। এইজন্য প্রত্যেকের নিমিত্তে যে প্রকার ভাব হৃদয়ে পোষণ করা ও যে প্রকার কার্য্য করিয়া সাধনের দিকে অগ্রসর হওয়া নির্দ্দিষ্ট আছে অল্পে অল্পে তাহার সহিত যোগে বিশুদ্ধভাবে ধর্ম্ম যোগ দেওয়া আবশ্যক। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির মনোগত ভাব ঈশ্বরবাণী দ্বারা জানিয়া যাহার জন্য যে নাম ও যে সাধন আবশ্যক তাহা তাহাকে সময়ে সময়ে বলিয়া দিয়া হৃদয়ের সন্তাপ নিবারণ করা প্রকৃত প্রচারক ও আচার্য্যের কার্য্য। এক প্রকার উপদেশ দ্বারা সাধারণের মন স্থির হইতে পারে না, হৃদয়ের ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করা আবশ্যক। এইরূপ উপদেশ না পাওয়াতে মানুষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতেছে।

স্ত্রী ও পুরুষের যোগ সকলের মূল

২২। এই জগৎ প্রেমের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, প্রেমেতেই ইহার স্থিতি ও বৃদ্ধি হইতেছে। জগতের রোগ, শোক ও মৃত্যুর কারণ সাধন ভজন ও সাংসারিক কর্ম্মকার্য্য, জ্ঞান ও প্রেম লাভ এবং সকল প্রকারের ঘটনা এই উভয়ের বিশেষ প্রেমযোগের সাধ্য। সাধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন এই প্রেমযোগের কাঠিন্য দূর হইয়া উভয়কে প্রকৃত প্রেমযোগে মিলিত করিবে তখন - তখনই কেবল স্বর্গের সোপান চক্ষুর সমীপে প্রকাশিত হইবে এবং মনুষ্য সিদ্ধযোগ প্রাপ্ত হইয়া সকল

অভাব হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এই বিষয়টি জীবনের পথে অগ্রসর প্রত্যেক ব্যক্তির মনে রাখা আবশ্যক।

একাকী সাধনের ইচ্ছা অর্দ্ধযোগ মাত্র

২৩। যদি কেহ এমত মনে করে যে স্ত্রী বা পুরুষের ভাব ভাল নহে, আমার সাধন ভজন আমি করিয়া ভব সাগর পার হইব, তাহা তাহার মনের বিকৃত ভাব মাত্র। এক জনে অর্দ্ধযোগ, দুই জনে পূর্ণযোগ, ইহা উৎপত্তির কারণের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বোধ হইবে। এইজন্য প্রত্যেকের ইহা মনে কর উচিৎ যে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ভাব ভাল হউক আর মন্দ হউক ঈশ্বর যখন তাহাকে আমার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন ও তাহার সহিত আমার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক চির সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন আমার ঈশ্বর সেবা তাহার মধ্যে ও তাহার ঈশ্বর সেবা আমার মধ্যে অবশ্যই আছে। বিশেষতঃ যখন জগতে প্রেম বিস্তার করিয়া জগৎ-প্রেমাধার ঈশ্বরকে হৃদয়ে গ্রহণ করা প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য, তখন যিনি নৈকট্যযোগ ধারণ করিতেছেন তাঁহার সহিত যোগসাধন বিষয়ে সদ্ভাবের আংশিক ত্রুটি থাকিলেও, অন্যকে ভালবাসা ও জগৎ-সাধন অসম্ভব। অতএব যাহাতে স্ত্রীর সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া জীবন উন্নত করা যায় তাহাই প্রত্যেক সাধন ভজনের পূর্ণ আদর্শ ও একতার কারণ। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার সাধন দ্বারাই জীবনের আশা সফল করিতে পারিবে না, পথিকের ন্যায় সঙ্গীর আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। সঙ্গ যোগই মধ্য বিন্দু, ইহার মধ্যে প্রবৃত্ত থাকিলে অচিরে জগৎ করতলে আসিবে সন্দেহ মাত্র নাই। যিনি সঙ্গিনী বা সঙ্গীকে বশীভূত করিয়া সাধনের মধ্যে আনিতে না পারেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি তাহার নিকটে

বসিয়া নাম জপাদি করেন ও তাহার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা বিশেষ প্রার্থনা করেন। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার মন ফিরিয়া সাধনের দিকে আসিতে থাকিবে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম

২৪। জনসাধারণের মধ্যে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য ও উপকারী বলিয়া অবধারিত হইয়াছে তাহাকেই ধর্ম্ম ও তদিতর যাহা তাহাকেই অধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা যাইতেছে। মনুষ্য ধর্ম্মকে আদর করিতেছে ও অধর্ম্মকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেছে। কিন্তু স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়াই হউক, অথবা স্বভাব দ্বারা চালিত হইয়াই হউক, অনেকে সময়ে সময়ে এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিতেছে ও অধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা বারম্বার জনসমাজে নিন্দিত ও রাজবিচারে দন্ডিত হইতেছে। শত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও মনুষ্য প্রবৃত্তির অধীন হইয়া চলিতেছে। অধর্ম্ম নিবারণের জন্য কত প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে অথচ তাহা সর্ব্বথা সফল হইতেছে না। অধর্ম্ম ঈশ্বর ইচ্ছার বিরুদ্ধ, এই সংস্কার লোকের মনে আছে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা নহে তাহা কখনই ঘটিতে পারে না, এই বিশ্বাসও সাধারণের মনে উদয় হয়, ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই ঈশ্বরের অমোঘ ইচ্ছার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঈশ্বরের এই অমোঘ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগতে অধর্ম্ম বিচরণ করিতেছে, ইহার সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? চিন্তা দ্বারা ইহাই স্থির হইতেছে যে, জগতে যেমন ধর্ম্মের প্রয়োজন সেই প্রকার অধর্ম্মের ও প্রয়োজন আছে। এইজন্যই অধর্ম্মের স্থিতি ও বৃদ্ধি ঈশ্বর ইচ্ছার বিপরীত নহে। তবে সাধারণের মনে যে ধর্ম্মের স্থিতি ও অধর্ম্মের বিনাশের ভাব বিচারণ করিতেছে তাহারও সার্থকতা লাভের কারণ সম্মুখে আছে। অধর্ম্ম দ্বারা দুঃখের কারণ উপস্থিত হয় বলিয়াই মানুষ অধর্ম্মকে

ঘৃণা করে। সে দুঃখ জীবন-মুক্তির সময়ে তিরোহিত হইয়া মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবে। সে সময়ে অধর্ম্ম ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বীয় অনিষ্টকারিতা দূর করিয়া ফেলিবে।

ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে কখনও বা ধর্ম্মেতে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মেতে ধর্ম্মের ভাব প্রকাশ পায়। এইজন্য জীবনের কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টি ধর্ম্ম কোন্‌টি অধর্ম্ম তাহা বিশেষরূপে স্থির করা কঠিন হয়। যাঁহারা ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়া আমিত্ব দোষকে দূর করিয়া ফেলিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই নির্ভিক হইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারেন ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আবশ্যক মনে করেন না। কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসু হইলে তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে যতদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বর সকলের চালক- ইহাতে স্থির বিশ্বাস করিয়া মানুষ জীবনের প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধে অকম্পিত হৃদয় হইয়া সন্দেহ রহিত না হয়, ততদিন অধর্ম্ম-ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। উক্ত অবস্থা যে সময়ে হইবে তখন মনুষ্যকেও অপরাধী বলিয়া বোধ হইবে না। ভ্রাতৃপ্রেম অটলভাবে হৃদয়ে জাগরিত থাকিবে।

ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমৎ স্বরূপের মধ্যে সর্ব্ব স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে

২৫। "সর্ব্বশক্তিমৎ"- এই একমাত্র স্বরূপেই ঈশ্বরের সর্ব্বস্বরূপ নিবেশিত রহিয়াছে। 'সত্যং' প্রভৃতি স্বরূপের এক একটি বিপরীত ভাব আছে, তাহাও তাঁহারই স্বরূপ। কেননা সত্য যেমন ঈশ্বর পরিচায়ক, অসথ্যও তেমনই ঈশ্বর বোধক। অন্য আর কেহ নাই যে তৎপ্রতি এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে। সত্যাসত্য উভয় এক, এই উভয়

বিপরীত ভাব ব্যতীত এই জগৎ তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না ; ইহাতেই ঈশ্বরের পূর্ণত্ব। বর্ণহীন ঈশ্বরের সৃষ্টিতে বর্ণ কোথা হইতে আসিল? সত্যাসত্য, জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতি সকল স্বরূপই তাঁহার। যদি কেবল অনুকূল স্বরূপের ভাব হৃদয়ে আনা যায় ও প্রতিকূল স্বরূপকে ত্যাগ করা যায়, তবে অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। আবার প্রত্যেক দুই দুই বিপরীত স্বরূপ স্মরণ করিয়া চিন্তা করিতেও স্মৃতি বিভ্রম হইতে পারে। এইজন্য উক্ত "সর্ব্বশক্তিমৎ" এই একমাত্র স্বরূপ হৃদয়ে চিন্তা করিয়া যখন সাধক সকল স্বরূপেরই যোগ লাভ করিতে পারেন তখন তিনি আরাধনার মধ্যে ইহাতেই মনোনিবেশ করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারেন সন্দেহ নাই। সর্ব্বশক্তিমৎ স্বরূপের বিপরীত ভাবও ইহার মধ্যেই আছে। সর্ব্বশক্তিমত্তার মধ্যে না আছে এমন বিশেষণ জগতে নাই ও হইতে পারে না। ইহার মধ্যে হৃদয় মন ছাড়িয়া দিলে আর কিছু বাকী রহিল বলিয়া মনে উদ্বেগ থাকিবে না ; একটি বিশেষণের মধ্যে জগন্ময় ঈশ্বরকে দেখিয়া উপাসকের মন পরমানন্দিত হইবে।

প্রতিকূল অনুকূল উভয় ব্যাপারকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবে

২৬। সর্ব্বশক্তিমৎ ঈশ্বরে পূর্ণ অপূর্ণ, প্রকাশ অপ্রকাশ, সত্য অসত্য, জ্ঞান অজ্ঞান, সদয় নিদয় ইত্যাদি সকল ভাব বর্ত্তমান আছে। এই কথা বলিতে অনেকের মন কুণ্ঠিত। কিন্তু কোন একটি ঘটনা যাহা আপাততঃ মন্দ বলিয়া পরিগণিত হয়, পরে তাহার ফল দেখিয়া অনেকে বুঝিতে পারেন ও বলেন যে উহা মঙ্গলের জন্যই হইয়াছিল। বস্তুতঃ পূর্ণ ঈশ্বরে ইহা আছে, উহা নাই, এইরূপ বলিলে সর্ব্বশক্তিমত্তা ও পূর্ণতার খর্ব্বতা করা হয়। সুখেতে মনের যোগ শেষ হয়,

দুঃখেতেও মনের যোগ শেষ হয়, এইজন্য এ উভয়ই মঙ্গলের কার্য্য। অতএব যেমন প্রত্যেক অনুকূল ব্যাপারকে, তেমন প্রত্যেক প্রতিকূল ব্যাপারকেও সাধক হৃদয়ে প্রেমের সহিত গ্রহণ করিবে। ইহাই পঙ্কচন্দনের তুল্যত্ব হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পূর্ব্বকার্য্য।

ধ্যানের অধিকারী

২৭। আধ্যাত্মিক ও বাহ্য জগৎ উভয়ই এক ঈশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং তাঁহাতেই স্থিত আছে। "নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ" ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না সুতরাং তাঁহা হইতেই সকল উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ তিনিই স্বয়ং সকল হইয়া লীলা করিতেছেন, ও তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট ইচ্ছার অধীন হইয়া এই জগৎ চলিতেছে ; এবং এই অসীম জগৎ ব্যতীত কোন একটি পরিমিত বস্তু হৃদয়ের তৃপ্তি দিতে পারে না, এই বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে স্থিরতর হইয়াছে, ধ্যানের বিশেষ অধিকার তাহারই জন্মিয়াছে।

ধ্যানের পূর্ব্বকার্য্য

২৮। প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে, সংসারী বা অসংসারী, বাস্তবিক বা অবাস্তবিক, কতকগুলি ভাব বিরাজ করে। কাহারও বা তাহার অবিকল,

কাহারও বা তাহার বিপরীত ভাব ধ্যানের সময় মনে রাখা আবশ্যক। যে সকল বস্তুর সাক্ষাৎ বর্ত্তমানতা কল্পনার মধ্যে আনিলে, উক্ত ভাব সকল আসিয়া মন স্থির হয়, গুরুর উপদেশানুসারে সে সকল ভাবসূচক বস্তু সকল কল্পনাতে সাক্ষাৎ জানিয়া নামরূপ ঈশ্বরের ধ্যান হৃদয়ে সাধন করিতে হইবে। নিজ নিজ ভাবানুযায়ী (যে ভাব গুরু ব্যতীত স্বয়ং উদ্ধার করা সম্ভবপর নহে) স্থূল বস্তুর সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা দর্শন ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত হইবে এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় একযোগে হৃদয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত করিবে। অধঃ ছাড়িয়া কেবল ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে জীবনের সারতত্ত্ব ও ঈশ্বর লাভ হইতে পারে না।

যে ভাবে ধ্যান করিলে আংশিকরূপে ধ্যান দ্বারাও সারতত্ত্ব জানা যাইতে পারে

২৯। হিন্দু শাস্ত্রাদিতে নানা প্রকার রূপের ধ্যান ব্যক্ত হইয়াছে। রূপের চিন্তা আংশিক ও তাহাতে মনকে সঙ্কীর্ণ ভাবের মধ্যে বদ্ধ রাখে। কিন্তু যেমন মনুষ্য হৃদয় ক্ষুদ্র আধারে নিহিত থাকিয়াও অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ ভাব পর্য্যন্ত ধারণ করিতে স্বীয় স্বভাব-নিহিত গুণেই সক্ষম, সেই প্রকার ক্ষুদ্র রূপের মধ্যেও বৃহত্তর ব্যাপার যোজনা করা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে জগতের যোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনের মালিন্য বশতঃ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ঈশ্বরের জগন্ময়ী যোগের ভাব প্রত্যেক রূপেতে আরোপ করিলে, ধ্যাননিষ্ঠ পরমযোগ লাভ করিতে বিলম্ব হয় না। এইজন্য মনের ভাব অনুসারে, যাহার যে রূপের ধ্যান আছে তাহাতেই জগৎরূপ ঈশ্বরের পূর্ণযোগ থাকা আবশ্যক। এইরূপ

সাকার ধ্যানের দ্বারা ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ ধ্যানযোগ লাভ করিয়া মনুষ্য সারতত্ত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

আচার্য্য হইতে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ দ্বারা নামের যোগ শেষ করিয়া ধ্যানের অধিকারী হইবে

৩০। ধ্যান চরম সাধন। ধ্যানের পূর্ব্বে নাম সাধন অবশ্যক। সে নাম স্বীয় হৃদয় যোগে লাভ করা কঠিন; এইজন্য আচার্য্য সন্নিধানে গমন করিবে। আচার্য্য হইতে একমাত্র নাম গ্রহণ করিয়াই যে নাম সাধনের শেষ ফল লাভ করিতে পারিবে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে না। কেননা সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামের যোগ প্রত্যেক মনুষ্যেরই লাভ করা প্রয়োজনীয়। তাহা সময় বুঝিয়া আচার্য্য বলিয়া দিবেন। তদনুসারে নাম জপ করিতে করিতে শেষ নাম লাভ করিয়া মনুষ্য ধ্যান ধারণার জন্য অধিকারী হইবে।

রোগাদির প্রতিকারের জন্য ঔষধাদির প্রয়োজন নাই

৩১। এই জগৎ এক নির্দ্দিষ্ট নিয়তির চক্রে ঘূর্ণমান আছে। মনুষ্য রোগ শোকাদির নিবারণের জন্য কেহ বা ঔষধ, কেহ বা স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন, কেহ বা কবচাদি ধারণ, কেহ বা কোন বিশেষ দেব সেবা ও কেহ বা ঈশ্বরের আরাধনা ও নানা প্রকার নাম কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে। উপকার লাভ করিলে উক্ত উপায়

সকলের মধ্যে কোন একটি দ্বারা ঐ উপকার পাইল বলিয়া মনে স্থির করে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা ও জ্ঞান দ্বারা ইহাই বোধ হইবে যে যখন যাহা হইবার নির্দিষ্ট আছে তখন তাহাই হইতেছে। ইহার দ্বারা উহা হইল এইরূপ স্থির করা ভ্রমাত্মক বিশ্বাস মাত্র। তবে এইরূপ কার্য্য দ্বারা ইহা ঘটিবে, বলা অপেক্ষা এইরূপ কার্য্যের পর ইহা ঘটিবে এইরূপ নির্দিষ্ট ছিল বলাই সঙ্গত। এই প্রাক্তনযোগ যাহার মনে স্থির হইয়াছে, তাহার কোন রোগাদির জন্য মন অস্থির হওয়ার কারণ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু যাহার মন ইহাতে খাঁটি হয় নাই তাহার নির্ভয় ও মনের শান্তির জন্য নামাদি সাধনই শ্রেয়; কেননা তাহাই সংসার এবং স্বর্গ উভয়ের সাধন। যে সাধন রোগাদির দুঃখ নিবারণ করিতে পারিল না তাহা কি কখনও পরিত্রাণ-প্রদ হইতে পারে? অতএব যাহা দ্বারা পরিত্রাণ লাভের আশা মনুষ্য হৃদয়ে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, রোগাদি নিবারণের উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ হইলেও কেবল তাহারই আদর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। "রোগ প্রতিকারের জন্য ঔষধের সৃজন করিয়াছেন"- ইহা বনৌষধিকে লক্ষ্য করে না।

রোগদি ক্লেশের দ্বারা মনুষ্যের সাধন সাধ্য হইতেছে

৩২। মনুষ্যের সাধন সাধ্য হওয়ার নিমিত্তে রোগ শোকাদি নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সংসারে বিচরণ করিতেছে। যে কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য শরীর সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত না হইবে, সে কাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত কোন উপায়েই রোগাদির নিবারণ হইতে পারিবে না ; যাপ্যভাবে থাকিয়া সময়ে সময়ে বারম্বার প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শরীর মনকে দগ্ধ করিবে। ইহাই অজানিত সাধন,

যদ্দ্বারা মনুষ্য নাম সাধনের প্রথম যোগ লাভ করিয়া হৃদয় মন ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতে সমর্থ হয়। রোগ শোকাদি দ্বারা যে সাধনের কার্য্য হয় তাহা মানুষ না জানাতেই ইহাকে অজানিত সাধন বলা হইয়াছে। যে সময়ে অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপিত হইয়া নামেতে হৃদয়ের বিশেষ প্রেম জন্মিবে, সে সময়েই পরস্পর মনে শান্তি আসিতে থাকিবে এবং তৎপর সাধনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানদি বিশেষ সাধন প্রণালী লাভ দ্বারা শরীর সাধন হইয়া রোগাদি দূর হইয়া যাইবে। সকল মনুষ্যই একদিন উক্ত নাম সাধনাদির অধীনে আসিবে ও কেবল সেই সময়েই রোগাদি হইতে মুক্তির প্রকৃত পথ লাভ করিতে পারিবে।

সকল নামের যোগ একটি নামেতে আছে

৩৩। নানা প্রকার নাম প্রকাশ করিয়া ঈশ্বর মনুষ্যকে সাধন যোগ প্রদান করিতেছেন। সাধকগণ তাহা হৃদয়ে বুঝিয়া নিজ নিজ সাধনসৌকার্য্যার্থে কার্য্য করিতেছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে আদি দেব "নারায়ণ" অবধি যত নাম ও মুসলমানদিগের মধ্যে "রহিম ও করিম" প্রভৃতি ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে "গড ও লর্ড" প্রভৃতি এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে যে সকল নাম প্রকাশিত হইয়াছে, সকলই প্রয়োজনানুসারে প্রার্থনার ফল। প্রত্যেক নামের অর্থানুযায়ী ও ধর্ম্ম পুস্তকের লিখিত প্রয়োজনানুযায়ী কার্য্যেপযোগিতার ভাবে এবং লোকের প্রকৃতি-যোগে তৎপ্রতি নানা প্রকার গুরুত্ব মনুষ্য মনে স্থান পাইতেছে। যেমন মনুষ্য মধ্যে জাতিগত পার্থক্য দূর না হইলে মঙ্গলের সম্ভাবনা অল্প, তদ্রূপ এই নামগত নানা প্রকার ভাব দূর হইয়া সকল মনুস্য এক নামে দীক্ষিত না হইলে সর্ব্বধর্ম্মের এক যোগ হইতে পারে না। এই নিমিত্তে সর্ব্বনামের যোগ এক

নামেতে দিয়া করুণাময় ঈশ্বর ধর্ম্মের সকল দ্বিধা দূর করিবেন এই অভিপ্রায় জানা যাইতেছে। সেই নাম কোন ভাষাতে অনুবাদিত না হইয়া এক ভাবে সকল মনুষ্যের হৃদয়কে অধিকার করিবে এবং সকলেই এই এক নামে দীক্ষিত হইয়া জীবনাশা সফল করিবে ও ভ্রাতৃ বিরোধ একেবারে দূর করিয়া দিয়া আনন্দ লাভ করিবে। সেই নাম- "দয়াময়," যাহা সদয় নিদয় উভয় ভাবে ভক্ত হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকারী ব্যক্তি ইহা হৃদয়ে বুঝিতে পারিবেন।

ভূত প্রেতাদির রূপ ও ঈশ্বরীয় রূপ

৩৪। ভূত, প্রেত, জিন, পৈরি প্রভৃতি অতিবাহিক দেহধারী কোন জীব অলক্ষিতভাবে কার্য্য করিতে ও নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যের অনিষ্ট বা ইষ্ট সাধন করিতে সক্ষম, অনেকের মনে অদ্যাপি এই বিশ্বাস বর্ত্তমান রহিয়াছে। শাস্ত্রাদিতেও ইহাদিগের বিষয় লিখিত আছে। এ সকলকে দর্শন ও শ্রবণের ভ্রম বলিয়া অনেকে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু বহু লোক যাহা চাক্ষুস দর্শন ও যাহার শব্দ শ্রবণ করিয়াছে তাহা কেবল ভ্রম বলিয়াই নিরস্ত থাকিলে মন সন্তুষ্ট হইতে পারে না। যদি ভ্রমও স্বীকার করা যায় তথাপি এ ভ্রমের মূল কোথায়? ভাবুক হৃদয় এক ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছাকেই লক্ষ্য করে। বাস্তবিক যেরূপ অন্যবিধ সংশোধনের ব্যাপার জগতে বিদ্যমান আছে সেইরূপ ইহাও একটি সংশোধনী মঙ্গল কার্য্য, যাহা ঈশ্বর ভিন্ন কোন সৃষ্ট জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনিই নানা রূপ ধারণ করেন, তিনিই শব্দ-যোগ দেন, তিনিই ইহার দ্বারা মনের চমৎকার ভাব উপস্থিত করিয়া যে কার্য্য দ্বারা যাহার আত্ম-জ্ঞান লাভ করা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সেইরূপ যোগ দিয়া

কার্য্য শেষ করেন। উক্ত প্রকার ভয়ের সময় "তুমি দয়াময়" এই নামের ভাব মনে করিলে অবশ্যই ভয় দূর হইয়া যাইবে।

স্বপ্ন বৃথা নহে

৩৫। স্বপ্নকে অনেকে ভ্রম ও তাহা দ্বারা কোন ফল হয় না বলিয়া স্বপ্নের কথার প্রতি মনোযোগ করে না। যখন স্বপ্ন সত্যরূপে প্রতীত হয় তখন তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করে। যখন ইহার ভাব কিছুই বুঝিতে পারে না, তখন বায়ুর বিকার বা মনের কল্পনা বলিয়া স্থির করে। বায়ু কার্য্যক্ষম নহে। মন ও আত্মার যোগে কার্য্য করে। যদি বায়ুর বিকার ও মনের কল্পনা স্বপ্ন দর্শনের কারণ হইত, তবে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এই দুয়ের পৃথক ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি হইত। যখন তাহাদের কোন ব্যত্তিত্ব নাই তখন একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাই স্বপ্নের কারণ, ইহা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। স্বয়ং ঈশ্বরের মুখে না শুনিলে, স্বপ্নের প্রকৃত তত্ত্ব কোন মনুষ্য জানিবার অধিকারী হইতে পারে না। রাত্রিদিবা শয়নে জাগরণে যে সকল ভাব মনে বিচরণ করে, তাহা সকলই স্বপ্নের কার্য্য। বাস্তবিক স্বপ্ন বৃথা নহে, তাহা মনুষ্যের ভ্রম ও অজ্ঞানতার যোগ শেষ করে। মনুষ্য ক্ষণকালও স্বপ্ন ছাড়া থাকিতে পারে না। স্বপ্নের প্রকার কিছু নিম্নে লিখিতে চেষ্টা করা গেল।

স্বপ্নের প্রকারভেদ

৩৬। স্বপ্ন চারি প্রকার যথা ঃ- সিদ্ধ, অসিদ্ধ, যোগ ও বিয়োগ। যে স্বপ্নের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্মরণ থাকে ও যাহার সত্যতা অচিরে লাভ হয় তাহাই সিদ্ধ স্বপ্ন। যে স্বপ্ন মনে থাকিয়াও মনের ভাবের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ব্যতীত বিশেষ কোন ফল প্রসব করে না তাহাই অসিদ্ধ স্বপ্ন। যে স্বপ্নে মনুষ্য দর্শন হয়, তাহা যোগ স্বপ্ন। যে স্বপ্নে মনুষ্য ব্যতীত অন্য সকল বস্তু দর্শন হয়, তাহা বিয়োগ স্বপ্ন। যোগ স্বপ্ন দ্বারা কখনও মনে আনন্দ এবং কখনও মনে নিরানন্দ জন্মে। তন্মধ্যে নিরানন্দ প্রধানকল্পে ঈশ্বরীয় ভাব মনে আনয়ন করে ; আনন্দে সে পরিমাণে উক্ত ভাব উদয় করে না। বিয়োগ স্বপ্ন যত মনের আনন্দ-দায়ক হয় ততই ঈশ্বর-প্রেম হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। যোগ বিয়োগের মধ্যে প্রত্যেক ভাব সিদ্ধ ও অসিদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। সিদ্ধ ও অসিদ্ধ, যোগ আর বিয়োগেতে পূর্ণ। অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কার্য্য উভয়ের এক যোগ ; এইজন্য উভয়ই যোগ-স্বপ্নে ও বিয়োগ-স্বপ্নে বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়। সিদ্ধযোগ ও বিয়োগযোগ এই উভয়ের মিশ্র ভাব হইলে হৃদ্‌কম্প হইয়া মনুষ্য হৃদয় রোগগ্রস্ত হয় ও তদ্‌দ্বারা শান্তির যোগ উপস্থিত হয়। অসিদ্ধ ও যোগ-স্বপ্নের দর্শনে মনুষ্য উদর রোগগস্ত হইয়া, পরে অনেক দিন সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতে সমর্থ হয়। যোগ ও বিয়োগ স্বপ্নের মিশ্র দর্শনে শিরোরোগ হয় ও তদ্‌দ্বারা মনের অশান্তি উপস্থিত হইয়া মানুষ প্রকৃত যোগ সাধনের উপযুক্ততা লাভ করে। অসিদ্ধ ও বিয়োগ স্বপ্নের মিশ্রত ভাব দর্শনে মনুষ্য সংসারে ক্লেশ পায় এবং মরণাপন্ন রোগগ্রস্ত হয়। যোগ ও বিয়োগ স্বপ্নের সহিত অসিদ্ধ মিশ্রিত থাকিলে সংসারে বিত্ত ধনাদি লাভ হয়। যোগ ও বিয়োগের সঙ্গে সিদ্ধ স্বপ্ন মিশ্রিত থাকিলে ভুবন বিজয়ী ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিয়া মনুষ্য সত্বর মনের যোগ নিবৃত্তি করতঃ জ্ঞান লাভ করে।

উক্ত চারি প্রকার স্বপ্নের মিশ্রিত ভাব দর্শনে সংসার আসার বলিয়া বোধ হয় ও সাধ্য-সাধনার কার্য্য উপস্থিত হওয়ার জন্য সংসারে অমঙ্গল দর্শন হয়। ধবল বর্ণ, ধূসর বর্ণ এবং কৃষ্ণ বর্ণ যাহারা দর্শন করে, তাহারা বিশেষ সাধক শ্রেণীতে গণ্য হয়, - যাহারা প্রকাশ্য রূপে দেখে তাহারা শীঘ্র জীবন-মুক্তি লাভ করে।

গুরু দর্শনে মনোরথ পূর্ণের পূর্ব্বে যোগ উপস্থিত হয়। আজীবন ধন্য-যোগ লাভ করিয়াও মানুষ স্থায়ী সুখ সম্পদ প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য সম্পদ এবং বিপদ উভয়ে এক যোগে কার্য্য করিয়া যখন মানুষকে ঈশ্বরের আপন শরণাপন্ন করে, তখনই তাহার প্রকৃত সম্পদ লাভের পূর্ব্বকার্য্য উপস্থিত হয়। এই কারণে স্বপ্ন দর্শনাদি নানা প্রকার ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর মনুষ্যকে শরণাপন্ন-যোগ দেন, হৃদয়ে প্রেম উপস্থিত করিবার জন্য প্রেমিকা ও প্রেমিক ব্যক্তির আগমন, সুখ ও সাদর সম্ভাষণাদি প্রিয়কার্য্য, এবং বিয়োগাদি দুঃখের যোগ দর্শন করান। মনুষ্য জীবনে কার্য্য ও ভাবে যাহা যাহা ঘটে, তাহা সকলই জীবন সংশোধন ও ঈশ্বরের পরমযোগ লাভ করিবার উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া স্বর্গলাভ অসম্ভব

৩৭। সংসারে জঞ্জাল দেখিলেই মনুষ্য সংসার ছাড়িয়া বনে যাইতে ইচ্ছা করে। সংসারে যে স্বর্গের সোপান রহিয়াছে তাহা একবারও মনে করিতে পরে না। প্রকৃত পক্ষে মানুষ কেবল জঞ্জালকেই পরিত্যাগ করিতে চায়, সংসার পরিত্যাগ করিতে চায় না। মনের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার জন্য কত প্রকার উপায় অবলম্বন করে,

সিদ্ধ না হইলে উদ্যোগের ত্রুটি ইত্যাদি তাহার কারণ বলিয়া মনে স্থির করে। কেহ কেহ ইহাও মনে করে যে, অনিত্য অস্থায়ী সংসারের ভাব চিরকালই এই প্রকার ; কখনও ইহাতে সুখ পাওয়া যাইবে না। এইরূপ মনে করিয়াও আবার সুখের ইচ্ছা মন হইতে দূর করিতে সক্ষম হয় না। ইহার দ্বারা ঈশ্বরের এই ইচ্ছা জানা যায় যে সংসারে আপাততঃ জঞ্জাল দিয়া সুখ লাভের পূর্ব্বকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক স্বর্গসুখ প্রদান করিবেন। সংসারে যাহার যত কার্য্য করিয়া স্বর্গের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহা তাহাকে করিতেই হইবে। অল্প অথবা অধিক পরিমাণে হউক, সংসারের কার্য্য সকলের জন্যই আছে এবং এই সংসারেই স্বর্গ আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য সকলেরই গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া স্বর্গ লাভ করা অসম্ভব।

ইন্দ্রিয় সেবাতে অতীন্দ্রিয় যোগ

৩৮। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় যোগে আপন আপন ভাব শরীরে প্রকাশ করিতেছে। যদিচ মুসলমান প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায়ী লোক আকাশকে দ্রব্যের মধ্যে গণ্য করেন না, কিন্তু তাহা ব্যতীত বায়ু প্রভৃতি তিষ্ঠিয়া থাকিবার স্থান আর নাই। বিশেষতঃ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা যখন বায়ুকে কোন একটি পাত্র হইতে বহিষ্কৃত করা যায় তখন সেই বায়ুশূন্য স্থানকে আর কোন্ বস্তু অধিকার করিয়া থাকে? ইহার উত্তরে আকাশ ও তদভ্যন্তরস্থ সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর, এই মাত্র বলা যাইতে পারে। বিশেষ কোন একটা ক্রিয়া দেখা যায় না বলিয়াই মুসলমান প্রভৃতি আকাশকে ভূত সমূহের মধ্যে গণ্য করেন নাই, এবং হিন্দুরা আধার বলিয়াই সক্রিয় মনে করিয়া ইহাকে দ্রব্য মধ্যে গণ্য করিয়াছেন ও তাহার কার্য্য শব্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ। ইহাতে মূল্যের কোন তর্ক

উপস্থিত হইতে পারে না। এখন প্রস্তাবিত বিষয়ে অবতরন করিয়া অগ্রে ইহা স্থির করা আবশ্যক যে শারীরিক ইন্দ্রিয় যোগে পঞ্চভূতের যেরূপ কার্য্য দৃষ্ট হয় তাহা অন্য কোন শক্তি দ্বারা অথবা ঈশ্বরীয় শক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। যদি বল ঈশ্বর ব্যক্তির সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর কার্য্যের ভার দিয়া রাখিয়াছেন ও তদ্দ্বারা কার্য্য চলিতেছে, তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রতি দোষারোপ হয়। কারণ এই যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় সুখের ইচ্ছুক হইয়া অথবা অনেক কার্য্য কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাতে সময়ের অভাবে স্বয়ং কার্য্য করিতে না পারিয়া অন্যের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন, কিংবা অন্যের শিক্ষা বা উন্নতির জন্য এইরূপ করিয়াছেন, ইহাই অনুমান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে আপন সৃষ্ট জগতের কার্য্যে অসুখ বোধ করে অথবা সময়াভাবে অশক্ত - এ প্রকার ঈশ্বরের এই জগৎ সৃষ্টি করিবারও অধিকার নাই। অন্যের শিক্ষা বা উন্নতির জন্য হইলে, যে প্রকারে সেই শিক্ষা বা উন্নতি হইবে তাহা না জনিয়াই তাহার প্রত্যেক পাঠ পঠিত হইতেছে। পাঠ নির্ব্বাচন শিক্ষকের হস্তে আছে। পাঠের কালে সময়ে সময়ে কত বিপরীত পাঠও পড়া হইতেছে। ইহার দ্বারা কার্য্য-ভার সৃষ্ট ব্যক্তির হস্তে দিয়া অকার্য্যের ভারও দেওয়া হইয়াছে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। কারণ কার্য্য-ভার দেওয়ার সময় ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা অকার্য্য সাধনও হইবে অবশ্যই এইরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। এই উভয় কার্য্যাকার্য্য ভার দেওয়া হইয়াছে বলিলে, পাপ ও পুণ্যের ভাগী আর কেহ থাকে না। বিশেষতঃ সৃষ্ট জীবের প্রতি কার্য্যভার অর্পিত থাকিলে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিত। যখন তাহা হয় না, তখনই ইহা স্থির হইল যে জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যই হইতেছে। যিনি যে কোন প্রকার কার্য্য করিতেছেন, তাহা সকলই তাঁহার লীলা ; অন্যের কোন ব্যক্তিত্ব বা কার্য্য-কারিত্ব নাই। আমি আছি এই বোধ মাত্রই দ্বৈত ভাবের ব্যাপার। আবার যত প্রকার কার্য্য সৃষ্টিতে আছে তাহা সকলই ভৌতিক ব্যাপার, এইজন্য

সকলই ইন্দ্রিয় সেবা। ঈশ্বর উপাসনা করিতে যাও, হৃদয় মনের তৃপ্তিতে শরীরের গ্লানি হ্রাস হইয়া যাইবে। দান দ্বারা নিজ মনের শান্তি ও অন্যের ইন্দ্রিয় সেবা ও তৃপ্তি সম্পাদিত হইবে। সকল কার্য্যই ইন্দ্রিয় সেবা কেবল সাক্ষাৎ ও গৌণ, এই তারতম্য। এই ইন্দ্রিয় সেবা, ঈশ্বরানুমোদিত জানিয়া যিনি প্রশান্তভাবে তাহা করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার অতিন্দ্রীয় যোগ লাভ হয়। পরিমিত বা অপিরিমিত হইল, সেইজন্য তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে হয় না ; কেননা তাঁহার ঈশ্বরই যোগ ও ঈশ্বরই ভোগ, তিনি সকল ঈশ্বরময় দেখেন ও হৃদয়ের ধন বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক শোকাদি বিপাক হইতে মুক্তি লাভ করেন।

সর্ব্বধর্ম্মের ঐক্যের নিমিত্তে বিশেষ লোক একজন আসিবেন

৩৯। জগতের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে যে সকল অবতার ও অবতীর্ণ ও প্রেরিত বা সাধু পুরুষের ভাব কার্য্য করিতেছে, তাহাদের কোন ব্যক্তিকেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। তাঁহারা সকলেই সময়ানুসারে আগমন করিয়া জগতের উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহাদিগের কার্য্যের ভাব পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়। কিন্তু একতার ভাব অভ্যন্তরে আছে। এই একতার ভাব তাঁহাদের লিখিত ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য জনৈক প্রশস্তমনা আচার্য্যের আবশ্যক। এমন দিন নিকট হইয়াছে, যে দিনে সর্ব্বধর্ম্ম সামঞ্জস্য ও সকল পার্থক্য দূর করিবার জন্য একজন আসিবেন, তাঁহার কথা জগৎ শুনিবে ও একতার পূর্ণযোগ লাভ করিয়া জীবন-মুক্তির সোপানে আরোহণ করিবে।

স্বাধীনতা

৪০। স্বাধীনতা মানুষের মহাধন। এই স্বাধীনতার জন্য কত যুদ্ধ, কত প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ পৃথিবীতে হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজ্যলোলুপ, ধনলোলুপ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের অন্য ব্যক্তির স্বধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপণ ও আক্রমণ, স্বাধীনতার অপব্যবহার সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতার লক্ষন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য লাভ। অন্যের পীড়ন হইবে বলিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে বাধা থাকিলে স্বাধীনতার খর্ব্বতা হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইলেও, যে কার্য্যে অন্যের অপকার হইল তাহা সেই ব্যক্তির ইচ্ছার বিরোধী হওয়াতে তাহার স্বাধীনতার ত্রুটি হইয়া গেল। জগতে যাহার যেরূপ ইচ্ছা তাহার ত্রুটিতে অনের ইচ্ছার তৃপ্তি দ্বারা যে স্বাধীনতা তাহা স্বাধীনতা নহে। কারণ এই যে, পরের দুঃখে মনের কাতর ভাব হওয়া সাধারণ প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের অন্যথাচরণ হইলে মন গ্লানিরহিত হইয়া থাকিতে পারে না ; বিশেষতঃ মন যাহা প্রার্থনা করে সকল সময় তাহাও লাভ করিতে পারে না বলিয়া স্বাধীনতার ভাব মনে থাকে না। পরন্তু সকলেই ঈশ্বরের অধীনতাকে স্বাধীনতার বিপরীত মনে করে না, অথচ অনিবার্য্য রোগ শোকাদি যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটিয়া থাকে তাহা স্বেচ্ছার বহির্ভূত বলিয়া তাহাতে ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। স্বাধীনতার নাম শুনিলেই মানুষ উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে তাহাতে যোগদান করে, তাহার স্বাধীনতার সীমা কতদূর তাহা জানিয়াও গাঢ় ভাবে মনে ধারণা হয় না। বাস্তবিক ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান ও নিজ ভাবকে সেই অগাধ স্বাধীনতার সমুদ্রে ডুবাইয়া সকল অভাব মোচন করিবার জন্য স্বাধীনভাব মাত্র মনে উদয় হয়। যাহারা ঈশ্বরের প্রেম বিশেষরূপে হৃদয়ে ধারণ করে ও তাঁহাতে বিশ্বাসী হইয়া

সকলেই তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার অধীন মনে করে এবং স্বকর্ম্মের ভাব ও অনিষ্টাশঙ্কা একেবারে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে অস্বাধীন ব্যাপারে কষ্ট দিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত স্বাধীন বলিয়াও তাহাদিগকে বলা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হইবে, কেবল তখনই আপনাকে স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে। এখনকার স্বাধীনতা কেবল মনের ভাব মাত্র।

জাতিগত পার্থক্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক মিল

৪১। হিন্দু ও মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানাদি যত প্রকার ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে আছে তাহাদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের সদ্ভাব অতি অল্প, বিশেষতঃ জাতিগত বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ভিন্ন জাতীয়ের সঙ্গে নাই।

মনের এই সকল পৃথক ভাবের মধ্যেও কোন এক ভিন্ন ব্যক্তির সহিত অপর কোন এক ভিন্ন ব্যক্তির দর্শনে, স্বার্থের সম্বন্ধ ব্যতীতই, মনে ভালবাসার উদয় হয়। ইহার কারণ বিজ্ঞান বলিবে, প্রকৃতিতে এইরূপ ভাব নিহিত আছে ; কিন্তু ঈশ্বর প্রেমেতে যুক্ত লোকেরা বিশেষভাবে প্রত্যেকের আপন আপন জীবন অনুসন্ধান করিলে ইহা অবশ্যই বুঝিতে পারিবে, যে বাহ্যিক জীবন যত কেন পৃথক হউক না, আধ্যাত্মিক জীবন জগতের যোগ রক্ষা করিতেছে। হিন্দুতে মুসলমান, মুসলমানে খ্রীষ্টিয়ান, খ্রীষ্টিয়ানে হিন্দু ইত্যাদি নানা জাতীয় ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে প্রকৃতির মিল ও চিন্তাগত ঐক্যভাব এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক যোগ

রহিয়াছে। ইহা অনেকে ব্যাপকতা বশতঃ কিছু কিছু বুঝিতে পারে, আবার অনেকের হৃদয়নিহিত ভাবের স্ফূর্ত্তি না হওয়াতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারে না। আধ্যাত্মিক যোগে মানুষের সকল কার্য্য হইতেছে, অচিরে তাহা বাহ্য যোগে পরিণত হইবে। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক প্রেম সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাতে যাহার স্থির বিশ্বাস হইবে তাহার হৃদয় হইতে শীঘ্রই বিবাদ বিসম্বাদের ভাব চলিয়া যাইবে।

সকল বস্তুই এক বলিয়া বিশ্বাস করা অযুক্ত নহে

৪২। পরব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া, স্বকীয় ও পরকীয় ভাবে বুদ্ধি-যোগ রক্ষা করিতেছেন। জীব মাত্রেরই মনে স্বকীয় ও পরকীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে। আবার সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই এই কথা প্রকাশ আছে যে, আপনার ন্যায় সকলেতে বিশেষ ভাব যাহার আছে, সেই সাধু। সর্ব্বদাই জগতে ঈশ্বরের লীলা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, অথচ মানুষ কতকগুলি বিষয়কে জড়াইয়া একটি রেখার মধ্যে নিজ নিজ কার্য্যে ও ভাবেতে স্বকীয় লীলা বোধ করিতেছে ; নানা প্রকার বস্তু ও তাহার গুণাগুণ বিবেচনায় তাহাদিগের আদর ও অনাদর করিতেছে। খাদ্য ও অখাদ্য এবং ঔষধি প্রভৃতির বিচার করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ ও কোন বস্তু ত্যাগ করিতেছে। এই দুই বিপরীত ভাবের মূল কোথায়? ইহার উত্তরে, যখন সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন উদ্ভবের স্থান মাত্র নাই, তখন পরমাত্মা হইতেই সকল, প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এই শেষ মীমাংসার উদয় হইবেই হইবে। কিন্তু এই প্রকৃত ভাবের মধ্যে মনকে স্থিরতর রাখিতে কেহই অদ্য পর্য্যন্ত পারগতা লাভ করেন নাই। বাস্তবিক সকলই যখন এক ঈশ্বর হইতে ও একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন বস্তুর সত্ত্বাই

নাই, তখন ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট বস্তু ও সকলই এক, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থাতে সিদ্ধযোগ লাভ হইলে ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস ও কার্য্যযোগ হইবে। যদিচ আপাততঃ শীতরৌদ্র ও পঙ্কচন্দনাদির পার্থক্য দেখা যায় এবং এ সকলকে এক করিয়া কেহ দেখাইয়া দিতে পারে না, তথাপি সিদ্ধযোগ লাভের পূর্ব্বেই এই বিশ্বোসের আরম্ভ কোন ব্যক্তির কোন সময়ে হওয়া প্রাক্তনযোগ।

বৃদ্ধিই জগতের লক্ষ্য

৪৩। এই জগৎ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ যে বস্তুর সৃষ্টি হয়, তৎসম্বন্ধে কেহ বলেন জল, কেহ বলেন তেজ, কেহ বা অষ্টম সূত্র (ইথর) অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম তরল পদার্থের উল্লেখ করেন। এই সকল নানা প্রকার ধ্যানলব্ধ জগতের প্রাগ্‌ভাব মনুষ্য মনে মতভেদ জন্মাইবার কারণ। কিন্তু ঠিকভাবে চিন্তা করিলে এই সকলই এক প্রকার এবং এক বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, জগতের কার্য্য প্রণালী দৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে, এক ঈশ্বর ইচ্ছা হইতেই শক্ত্যাত্মক পুরুষ এবং প্রকৃত্যাত্মক ভূমির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর এবং কার্য্যের মধ্যে এই দ্বিবিধ ভাব লক্ষিত হইতেছে, এই নিমিত্ত অগ্রে যে বস্তুরই উৎপত্তি হইয়া থাকুক ও যিনি যাহা বলুন না কেন, এই জগৎ প্রকৃতিপুরুষাত্মক মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন। সৃষ্ট প্রকৃতি, পুরুষাত্মক এক শক্তি যোগে উন্নতি ও অনুন্নতির ভাব প্রকাশ করিতেছে। ঈশ্বরেতেই এই উভয় প্রকৃতিত্ব ও পুরুষত্ব বিরাজমান, এইজন্য প্রত্যেক বস্তুতেই এই উভয় ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিয়া জগতের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে, আবার দুই কিংবা অধিক বস্তু একত্রিত হইয়া পরিবর্ত্তিতরূপ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে দন্ডায়মান হইতেছে। এইরূপে জড়, উদ্ভিদ ও

জীব সকলের বৃদ্ধি প্রক্রিয়া জগতে লক্ষিত হইতেছে। এই বৃদ্ধির কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া, জীব সকল আপন আপন উদর পূর্ত্তি করিবার জন্য নানা প্রকার উদ্ভিদ ও ঔষধি এবং জীবজন্তু ভক্ষণ করিতেছে। এক জীবের সহিত অন্য জীবের চির সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবার জন্য, জগতে নানা প্রকার ভাব ও কার্য্য অর্থাৎ একজনের সহিত আর একজনের বিবাদ বিসম্বাদ ও প্রেমযোগ প্রকাশ করিতেছে। অহোরাত্র সাধ্য সাধনার যোগে এই বৃদ্ধির কার্য্যই প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছাতে যত প্রকারের কার্য্য সংসারে হইতেছে, সমুদয় কার্য্যেতেই এক বৃদ্ধি যোগ লক্ষিত হইলেও কোন কার্য্যে বাধা বিঘ্নের যোগ শূন্য দেখা যায় না। ইহার উদ্দেশ্য, সাধনের পরিপক্কাবস্থা আনয়ন করা ভিন্ন অন্য নহে। মনুষ্য যতদিন এই বৃদ্ধি সাধনকে আপন জীবনের বিশেষ ব্রত বলিয়া স্থির বিশ্বাস করিতে না পারিবে, যতদিন শরীর মন অর্পণ করিয়া ইহাতে তৎপর না হইবে ও যতদিন কুণ্ঠিত মন থাকিবে, ততদিন পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে জীবন-মুক্তি লাভ করিতে ও নরকের অবস্থা দূর করিতে অর্থাৎ রোগাদি দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য লাভ করিতে পারিবে না।

মনের যোগ শেষ হইলে ঈশ্বর দর্শন লাভ হইবে

৪৪। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক- এই পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে ঈশ্বর মনুষ্যভাবে কার্য্য করিতেছেন। ইহার মধ্যে বিষয়, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সকলই বিরাজ করিতেছে। কার্য্য ও কারণের যে বিশেষ সম্বন্ধ তাহা বিষয়যোগে অল্প দৃষ্ট হয়। মনুষ্য আপন জীবনের কার্য্যে সুবিধা দর্শন না করিয়াই মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত

কার্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হইবে না- এইরূপ মনের ভাব উপলক্ষ্যে সময়ে সময়ে নিরাশকূপে পতিত হইতেছে ও আমার আমার করিয়া আমি দুঃখ ও সুখভাগী, আমি সক্ষম ও অক্ষম এবং আমি একজন পৃথক ব্যক্তি এইরূপ ভাবিয়া জীবন যাপন করিতেছে। ইহারই নাম মনের যোগ। এই মনের যোগেতেই সৃষ্টির কার্য্য চলিতেছে। এই মনের যোগ দূর হইয়া যাহার জীবনের যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা লাভ করিবার জন্য যে পন্থা তাহাই সাধন ভজন। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের ন্যায় এই সাধন ভজন ও প্রত্যেকের জন্য প্রকার ভেদে পৃথক পৃথক। যাহার যে প্রকৃতি তদনুসারেই মনের ভাব ও কার্য্যের এই প্রভেদ হয়। আবার এই সাধনের মধ্যেও অরি-দমন অর্থাৎ অন্তরায় নিবারণ না হইলে প্রকৃত সাধন সম্পন্ন হয় না। কালে হইবে, এই আশা সকলেরই মনে ঈশ্বর দিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণেই নানা প্রকার অনিবার্য্য দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়াও মানুষের মন ভঙ্গ হয় না। পূর্ব্বে যে মনের যোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরবাণী শ্রবণের বিশেষ যোগ যাহাদিগের মধ্যে হইবে, তাহারাই ইহার বিশেষ ভাব বুঝিতে পারিবে। পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষী যেমন সর্ব্বদা ছুটিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ মনুষ্যও আপন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘনিষ্ঠ ঈশ্বরীয় যোগ লাভ করিবার জন্য নানা প্রকার ভাব ও কার্য্য অবলম্বন করে। অথচ কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে তাহা সকল সময় বুঝিতে পারে না। সুখের ইচ্ছা সেই সুখময় ব্যতীত আর কোথায় পূর্ণ হইতে পারে? বাস্তবিক মনের যোগেই ঈশ্বর হইতে একটি পৃথক অস্তিত্বের ভাব হৃদয়ে দিতেছে। যে সকল অন্তরায় অতিক্রম করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে, তাহার চেষ্টাই মনের যোগ-সাধন। সাংসারিক ও অসাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যেই মনের যোগ সাধিত হইতেছে। এই মনের যোগ শেষ হইলেই ঈশ্বর দর্শন লাভ হইবে।

সাধকতা

৪৫। এই মনের যোগ সাধিত হওয়ার জন্য ঈশ্বর, মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে ২৫ (পঁচিশ) প্রকারের সাধকতা নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যেও পঞ্চ প্রকার উচ্চ সাধকদিগের মধ্যেই অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইবে। অবশিষ্ট ২০ (বিংশতি) প্রকার অন্য লোক সকলের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

উক্ত পঞ্চ প্রকার যথা–

১। শ্রবণ-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা ঈশ্বরবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক স্বীয় ও পরকীয় জীবনের ভূত ও ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমানের অবস্থা জানা যায়।

২। দর্শন-সাধকতা ঃ যাহা দ্বারা ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়া মনুষ্য চিরজীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

৩। বিদ্যা-সাধকতা ঃ যাহা দ্বারা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে সক্ষম হয়।

৪। ইচ্ছা-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা ঈশ্বর ইচ্ছার সহিত মনুষ্য ইচ্ছার মিলন হইয়া যায়।

৫। হৃদয়-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা মনুষ্যের হৃদয় ঈশ্বরের সহিত তুল্যভাবে জগতে কার্য্য করে।

অপর বিংশতি প্রকার যথা-

১। সিদ্ধি-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা মনুষ্য হৃদয় ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন থাকে।

২। জগত-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা জগতে ভালবাসা বিস্তার হয়।

৩। প্রেম-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা মনুষ্যের প্রেম আকর্ষণ করে।

৪। কার্য্য-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা জীবনের কার্য্য জানা যায়।

৫। লক্ষ্মী-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ লাভের উপযোগিতা লাভ হয়।

৬। সম্পদ-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা সকল অভাব মোচন হয়।

৭। অরি-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা ধর্ম্ম পথের বাধা বিঘ্ন দূর হইয়া যায়।

৮। রবি-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা শারীরিক বল বীর্য্য লাভ হয়।

৯। চন্দ্র-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা কার্য্য সাধনে আয়াস ও আলস্য দূর হয়।

১০। শরীর-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা শরীর রোগ হইতে মুক্ত হয়।

১১। দৃষ্টি-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা শরীরে দৃষ্টিমাত্র সদ্ভাবের উদয় হয়।

১২। রস-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা প্রেমরস পানে একাগ্র চিত্ত হয়।

১৩। রূপ-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা রূপ ও অরূপ উভয়ের একতা ইন্দ্রিয় গোচর হয়।

১৪। মৃত্যু-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা মনুষ্য অমর হয়।

১৫। উর্দ্ধর-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা শরীরের উর্দ্ধরতা সাধিত হয়।

১৬। কাল-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা কোন্ সময়কে কি কার্য্য তাহা স্থিরীকৃত হয়।

১৭। দেশ-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা কোন্ স্থানে কি কার্য্য তাহা জানা যায়।

১৮। পাত্র-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা কোন ব্যক্তির সহিত আপন জীবনের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা জানা যায়।

১৯। পতি-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা স্ত্রীগণ আপন আপন জীবনের সঙ্গীদিগের সুখসাধনে ও ধর্ম্মবর্দ্ধনে সক্ষম হয়।

২০। স্ত্রী-সাধকতা ঃ যাহার দ্বারা স্ত্রীদিগের সুখসাধনা এবং তাহাদিগকে সাধনের সঙ্গিনী করণে পুরুষ সক্ষম হয়।

এই সকল সাধকতা মনুষ্য হৃদয়ে অপূর্ণভাবে কার্য্য করিতেছে। কালেতে সাধনের সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগের পরস্পর উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। এই পঞ্চবিংশতি সাধকতাতে মনোযোগ থাকিলে অমিতব্যয়ীদিগের মিতব্যয়ের ভাব, অত্যাচারীদিগের সদাচার, অপ্রেমিকের প্রেম-সঞ্চার, সর্ব্বকার্য্যে পারদর্শিতা এবং ভাব্য ভাবনার শেষ ফল- দর্শন ও শ্রবণ যোগের আরম্ভ, অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যেই হইতে পারে।

ঈশ্বরীয় যোগ লাভের পূর্ব্বক্ষণে একবার সংসারের অকুশল অনিবার্য্য

৪৬। মনুষ্য জগতে সংসারী ও অসংসারী ভাব বিচরণ করিতেছে। যে সকল কার্য্য কলাপাদি দ্বারা আহারীয় পানীয় প্রভৃতি লাভ হয় এবং মান সম্ভ্রমাদি রক্ষা পায় তাহার নাম সংসার। আর ঈশ্বরীয় প্রেমে নিমগ্ন হইয়া মন যাহা চায় তাহার নাম অসংসার। এই উভয় সংসার এবং অসংসারের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য একস্থানে মিলনের ব্যাপার বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও মনুষ্য তাহা না জানিয়া সংসারের জন্য ব্যস্ত ভাবে কার্য্য করে ও সময়ে সময়ে নৈরাশ্য অবলম্বন ও পরিত্রাণের কিছুই করিলাম না বলিয়া অনুতাপ করে। যেমন অযৌক্তিক কার্য্য করিয়া তাহার মন্দ ফল ভোগের পর যুক্তিযুক্ত কার্য্যের আদর উপস্থিত হয়, সেই প্রকার সংসারে মগ্ন মন কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অসংসারী বাসনা গ্রহণ করে। তখন সংসার ও অসংসার পর্য্যায়ক্রমে হৃদয়কে অধিকার করে ও পরস্পর অসংসারী ভাবের সময় বৃদ্ধি

পাইয়া সংসারী ভাবের সময় অল্প হইতে থাকে। এইরূপে অন্তরায় ও ব্যবধান রহিত অসংসারী যোগ লাভ করিয়া জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় ও সংসার অসংসার এক বলিয়া মনে স্থির বিশ্বাস করিতে পারে এবং মনের স্থিরভাব লাভ করিয়া সকল সাংসারিক অভাব ও রোগ শোক হইতে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু এই অবস্থা লাভের পূর্ব্বে একবার সাংসারিক অকুশল অনিবার্য্য, কেননা তাহা হইতেই মনুষ্য স্বর্গীয় যোগ লাভের সোপানে আরোহণ করিবে ইহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

পরলোক

৪৭। মনুষ্য-আত্মা শরীর ধ্বংসের পর যে স্থানে অবস্থিতি করে সে স্থানকে 'পরলোক' এই নামে অভিহিত করা যায়। আত্মা যখন অবিনশ্বার তখন শরীরের মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থিতির জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান না থাকিলে অমরত্বের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয় না। ইহলোক শরীর স্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আত্মা শরীর পরিত্যাগের পর কিরূপে অথবা কিভাবে কোন্ স্থানে বাস করে অধ্যাত্ম-যোগ-বল ব্যতীত তদ্বিষয়ে অন্য যৌক্তিক প্রমাণের অসদ্ভাব। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা ব্রহ্মলোক, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থানে, মুসলমানাদি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ সমাধী-স্থানে মৃত মনুষ্যের আত্মার অবস্থিতি বিশ্বাস করে, কিন্তু স্বর্গ নরকের ভাব এই সকলের মধ্যেই আছে। ব্রাহ্মেরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই, পরলোক আছে মাত্র স্বীকার করেন। যদি পরলোকে আত্মার কোন একটি নিবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তবে ইহাদিগের মধ্যে অনৈক্যের ভাব থাকার কোন কারণ ছিল না। বাস্তবিক ইহকাল ও পরকাল শরীরের জন্য, আত্মার জন্য নহে। শরীর না থাকিলে সূক্ষ্ম আত্মার যোগ ঈশ্বরের

সহিত অভেদ, সুতরাং আত্মার নিবাসের জন্য কোন স্থানের আবশ্যকতা বোধ করা অলীক। সকল প্রকারের শরীরই কোন একটি ঐশ্বরিক কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে জন্ম ধারণ করিয়াছে। তাহারা একবার স্থিতিযোগ লাভ করিয়া চিলকালই মৃত্যুতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে, মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে না এবং বন্ধুজনের হৃদয় শোকার্ত্ত থাকিবে আর শীতল হইবে না, এইরূপ কখনই হইতে পারে না। এমন সময় অবশ্যই আসিবে যে সময়ে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি শরীর লইয়া মনুষ্যের স্বপ্নদর্শনের ব্যাপার সফল করিবে এবং বন্ধুজনের চিরশোক নিবারণ করিয়া জীবন-মুক্তি লাভ করিবে। তখনই পরলোকের ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। পৃথিবীর লোক অন্য কোন লোক-গুলোতে যাইয়া অবস্থিতি দ্বারা সুখ বোধ করিবে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে না।

বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ লাভ না করিলে সাধনের কার্য্য শেষ হইতে পারে না

৪৮। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও মনুষ্য সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বরের জন্য বিশেষরূপে ব্যস্ত হইতে পারে না। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ সময়ে সময়ে যে ব্যস্তভাব হয়, তাহা জীবনের সারমর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, অসার চিন্তার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায় এবং ধারণার অসাধ্য হইয়া পড়ে বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হয় না। আজীবন ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকিয়াও লোক সকল আসার বৈষয়িক চিন্তা মনে করতঃ অলীকবাদী তপস্বীর ভাব ধারণ করে, অথচ লোকের নিকটে কথঞ্চিৎ সাধক বলিয়াই পরিগৃহীত হয়। হৃদয়ের গ্রন্থিতে, মনের ভাবে, অসাধন এবং সাধন উভয়বিধ ভাব বিরাজ করে, সুতরাং সম্যক প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত না হওয়াতে সকল লোক

প্রেম লাভ করিতে পারে না, বিশেষতঃ শান্তি-যোগ লাভ ও সন্দেহ নিবারণ হয় না বলিয়া সর্ব্বদা মন সশঙ্কিত থাকে এবং নিজ কার্য্য কর্ম্মের নির্দ্দোষিতা অকম্পিতভাবে মনে ধারণ করিতে পারে না। মনে শান্তি লাভ করাই সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সন্দেহ নিরাকৃত না হইলে হইতে পারে না। নানা প্রকার মত ও মনের ভাবের মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য এক ঈশ্বরেতে যোগ-শেষের অবস্থা শীঘ্র লাভ করিতে পারে না। সাধনের কার্য্য আরম্ভে কল্পনা, আসন, বসন, তীর্থভ্রমণ, শ্মশানাদিতে জপ, মুদ্রা, পূজা, প্রচারাদি এবং ভক্তগণের যোগাদি নানা প্রকার কার্য্য অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই হিন্দুদিগের মধ্যে সিদ্ধির কথাও শুনা যায়, কিন্তু এই আংশিক সিদ্ধি দ্বারা জগতের বিশেষ উপকার হইতে পারে না ও তাহা অচিরকাল মধ্যেই অবসন্ন হইয়া যায় এবং জগতে আন্দোলন মাত্র রাখিয়া জীবন শেষ হইয়া যায়। জগতের যোগ লাভ না করিলে কোন প্রকারেই প্রকৃত সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। কোন প্রকারের ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই প্রকৃত সিদ্ধির পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। সকলেই মনে করে যে আপন আপন কার্য্যেতে সিদ্ধির ভাব আগমন করিতেছে, অথচ নানা প্রকারের সন্দেহ হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকে। যখন মনুষ্য সর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সর্ব্বময় ঈশ্বরের শরণলাভে কৃতসংকল্প হইয়া জপন, মন ও ধ্যান এবং অব্যবধানে ঈশ্বরীয় যোগ লাভ করে, তখনই কেবল মানুষ সিদ্ধির পথে দন্ডায়মান হয়। অতএব বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ লাভ না করিলে সাধনের কার্য্য শেষ হইতে পারে না।

ঈশ্বরবাণী হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়ার প্রকার ভেদ

৪৯। লোকের উপকার ও নিজ সাধনের সুবিধার জন্য ঈশ্বর বাণী শ্রবণ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরবাণী মানবাত্মাতে প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব, ইহা মনের কল্পনা মাত্র। যখন ঈশ্বর জীবন্ত জাগ্রতভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান ও আত্মাতে সর্ব্বদা সংলগ্ন, এবং ভাব্য বিষয় উপস্থিত করিয়া তাঁহার চরণামৃত পানে উক্ত অধিকার লাভ হইবে বলিয়া হৃদয়ে বিশ্বাস দিতেছেন এবং তাঁহার দর্শন, বাক্য শ্রবন ও কোন কোন কার্য্যের মঙ্গলামঙ্গল পূর্ব্বে জ্ঞাত হওয়ার জন্য সকলেরই মনকে লালায়িত করিতেছেন তখন ইহার চরিতার্থতা বিষয়েও ঈশ্বরের ইচ্ছা রহিয়াছে ইহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। বাণী প্রকাশ ব্যতীত ইহার চরিতার্থতা হইবার অন্য উপায় নাই। এইজন্য ঈশ্বর মনুষ্যহৃদয়ে কথা বলেন এ বিশ্বাস অলীক নহে। যাঁহারা বাণী শুনিয়াছেন কেবল তাঁহারাই ইহার সাক্ষ্য দিতে সক্ষম, অন্যের বুঝিয়া উঠা কঠিন। বিশেষতঃ হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী সাধকগণ ইহার নানা প্রকার প্রমান জনসমাজে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অগ্রাহ্য করা ও মূর্খতার কার্য্য। রোগী উপকারার্থে একবার ঔষধ সেবন করিয়া বিস্বাদু বোধ হইলে পুনর্ব্বার ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, সেইরূপ একবার ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া মনে অশান্তির উদয় হইলে বিশ্বাস অভাবে সাধনে পরান্মুখ বক্তি, ঈশ্বরবাণী শ্রবণ হওয়া অসম্ভব - এই কল্পনা মনে স্থান দিয়া প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করে ও সংসার চিন্তায় মগ্ন থাকে। ঈশ্বরবাণী চারি প্রকারে মানুষের নিকট প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ নীল এবং হরিদ্রা বর্ণ যুক্ত রেখা হৃদয়ে

উপস্থিত হইয়া তাহার নিমীলনে ও উন্মীলনে অকর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্যের পরিচয় দান করে। দ্বিতীয়ঃ শব্দ-মুখ অর্থাৎ শব্দ করে এমন একটি মুখের ন্যায় হৃদয়ের নিকটে বোধ হয়। এই দুইটি লাভ করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই নির্দ্দিষ্ট আছে। তৃতীয়তঃ হৃদয়ে একটি চক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে, তাহার মধ্যে ঘোর ঘোর কোন কথা বুঝিতে পারা যায়। তাহার কতকদিন পরে অন্য লোকের এবং নিজ সম্বন্ধীয় কথা মনেতে বিশেষভাবে উদিত হইতে থাকে। এইরূপ চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া মধ্যে কয়েকদিন স্থগিত থাকিয়া পুনর্ব্বার এবং এইরূপে বারম্বার হইতে থাকে। একবার আন্দোলনের পর এইরূপ বাক্য পরস্পর উন্নতভাবে মনেতে উদিত হইয়া পরিপক্ক হইতে থাকে। চতুর্থতঃ যে সকল কথা মনে উদিত হয় তৎপ্রতি আপনার বলিয়া পরিগ্রহ থাকে না, ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন বলিয়া স্থির বিশ্বাস হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণের মধ্যে সাধ্যযোগ। ঈশ্বরবাণীর পরিপক্কাবস্থাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধীয় ব্যাপার প্রকৃতভাবে জানা যাইতে পারে।

ঈশ্বর দর্শন

৫০। দর্শন-যোগ লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকের মনেই সময়ে সময়ে বিশেষ ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে। বিশেষভাবে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করাই সাধনের শেষ ফল। মানসিক যোগ যতদিন সংসারেতে থাকে, ততদিন ঈশ্বরানুরাগ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত

হয় না বটে, কিন্তু সিদ্ধ সাধকতার বীজ যাহা অন্তরে নিহিত রহিয়াছে তাহা তাহার মধ্যেও অপ্রকাশরূপে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। যে সময়ে মনে একবার ঈশ্বরীয় যোগ উপস্থিত হয় তখন প্রথমতঃ চমৎকার ভাব আসিয়া মনকে কিছুকালের জন্য বিগলিত করে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিবিম্ব সদৃশ ভাব উপস্থিত হইয়া আলোকিত বর্ণ দর্শন করায়। কেহ অধিক পরিমাণে মনে বিশেষ ভাব ও কেহ বা অধিক পরিমাণে দর্শনের বিশেষ ভাব লাভ করে। এ সময়ে কেহ কেহ দশা প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান হয়, কেহ বা ঘূর্ণিত মস্তক হয়। কেহ বা উক্ত প্রকার মনের ভাব ও দর্শন আরম্ভ হইলেও নানা প্রকার গোলযোগে উক্ত মনের ভাব ও দর্শনের অভাবে পড়িয়া অনেক কাল উন্নতির ভাব রহিত হইয়া থাকে, কেহ বা অল্প অল্প বিচ্ছেদের পর পুনর্ব্বার ঐ ভাব ও দর্শন লাভ করিয়া মনে শান্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে দর্শন বিষয়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরবাণী শ্রবণেরও উন্নতি হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর দর্শন বাহিরের চক্ষে হইতে পারে না। ইহা সাধনের তত্ত্ব লাভ না করারই ফলস্বরূপ। বাস্তবিক এই চক্ষু যাঁহা হইতে আসিল, ইহার জ্যোতি যে দিল, এবং স্রষ্টার দর্শনের ইচ্ছাতে মনকে যে পরিপূর্ণ করিল, সে এই চক্ষুর দর্শনীয় না হইয়া লুক্কায়িতভাবে থাকিবে ও চক্ষুর ফল দিবে না, যে তাঁহার শক্তির পূর্ণতায় মনে স্থিরভাবে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার মনে কখনই এই নিরাশের ভাব থাকিতে পারে না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা হৃদয়ে বোধ হইলেও দর্শন দ্বারা ইহার তত্ত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারিলে মনুষ্য মনের দ্বিধা সম্যক্ প্রকারে দূর হইতে পারে না। কেহ স্থূলকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মকে স্থূল বলিতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক বস্তু সূক্ষ্ম হইতে উদ্ভূত অথচ স্থূলত্বে পরিণত হইয়া ইন্দ্রিয় গোচর হইতেছে ; ইহা আদি অন্ত চিন্তা করিলে সকলেরই মনে উদিত হইবে। চাক্ষুষ না দেখিলে মনে সর্ব্বপ্রকারের ধারণা হয় না, এই জন্য ঈশ্বর দর্শন বিশেষরূপে লাভ হওয়া

আবশ্যক। প্রত্যেক বস্তুর আদিম সূক্ষ্মভাব দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর হইবে। দর্শনের বাধা সত্ত্বেও তাহা অতিক্রম করিয়া দর্শন-শক্তি প্রবল হইবে ও সকল ইন্দ্রিয়েরই অতীন্দ্রিয় যোগ লাভ হইবে, সাধকের মনে এ আশা সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছে। যেমন চক্ষুর যোগে দর্শনীয় পদার্থ দর্শন হয় এবং মনের মধ্যে রূপের ধারণা চিরকাল অবস্থিতি করিতে থাকে, তদ্রূপ চক্ষু ও মনের যোগ লাভ করিয়া একবার দৃষ্ট বস্তু বারম্বার চক্ষুর গোচর বলিয়া বোধ করে। কিন্তু যে স্থানের ভাব মনেতে উদয় হয় সে স্থানের বস্তু সকল প্রত্যক্ষের ন্যায় বোধ হইলেও উন্মুক্ত চক্ষে দর্শন করিতে দর্শনের মধ্যবর্ত্তী যে সকল বাধা দৃষ্টি রোধ করিতেছে তাহা দূর না হওয়াতে উন্মুক্তভাবে দর্শন লাভ হয় না। সাধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের শক্তি চক্ষুতে সংলগ্ন হইতে থাকিবে ও সমস্ত বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া অল্পে অল্পে দৃষ্টি প্রকাশিত হইবে এবং বাহিরের বস্তু গৃহ মধ্য হইতে দৃষ্ট হইবে। ইহারই নাম ঈশ্বর দর্শন। এই দর্শন যাহার আরম্ভ হইবে তাহারই জীবন-মুক্তি লাভ হইবে। ইহাতে কোন ব্যক্তিরই নিরাশ হওয়ার কারণ নাই, কেননা প্রকৃততঃ চক্ষুর ফলই এইরূপ দর্শন।

যে নিয়মে দর্শন ও শ্রবণ পর্য্যায়ক্রমে উন্নত হইতে থাকে

৫১। ঈশ্বরবাণী শ্রবণের পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে দর্শন-যোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সাধ্য-যোগ উপস্থিত হইয়া ব্যায়াম-যোগেতে মন কুণ্ঠিত হয়। সাংসারিক কর্ম্ম কার্য্য একবার পরিত্যাগ করিয়া পরে বিশেষভাবে সংসারের কার্য্য ও ঈশ্বরীয় কার্য্য এক জানিয়া মন শান্ত হয়; এবং তৎপর আত্মসমর্পণরূপ বর্ত্মের মধ্যে থাকিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অকুতোভয়ে দন্ডায়মান হয়। তখন, যে সময়ে ঈশ্বরেতে মনের

বিশেষ যোগ হয়, সে সময়ে কেহ নীলবর্ণ কেহ বা রক্তবর্ণ ও কেহ কেহ হরিদ্রাবর্ণ ইত্যাদি আলোক দর্শন করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ আলোক আপন আপন হৃদয়নিহিত বর্ণের পরিচায়ক। যে বর্ণে যাহার মনে শান্তি বা অশান্তি হয়, আবশ্যকানুযায়ী সেই বর্ণের আলোক তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর হয়। ইহাই সাধকত্বের পরিপক্কাবস্থার পূর্ব্বকার্য্য বলিয়া বলা যাইতে পারে। এইরূপ দর্শন আরম্ভ হইলে হৃদয়নিহিত ঈশ্বরীয় যোগ প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরবাণী দুই তিনবার কিছু কিছু করিয়া আসিতে থাকে। চার পাঁচ মাস স্থগিত হইয়া পুনর্ব্বার বিশেষভাবে আসিতে থাকে। এই রূপে কার্য্য হইতে হইতে মধ্যে মধ্যে কতক কতক বাণী শ্রবণ ও কতক কতক আলোক দর্শন হইতে থাকে। শান্তিকর দর্শন-যোগ একবার লাভ হইলে পরে সকল প্রকারের মন্দ একযোগে অশান্তিকর বর্ণালোক সময়ে সময়ে উপস্থিত করতঃ মনের নিরানন্দ উৎপাদন করে। এই উভয় শান্তি ও অশান্তিকর বর্ণের আলোক দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিকর এবং অশান্তিকর শ্রবণ ব্যাপারও হইতে থকে। শ্রবণযোগ আরম্ভের পূর্ব্বে যে একবার শান্তিকর দর্শন ইন্দ্রিয় গোচর হয, তাহা পরে অনেক দিবস পর্য্যন্ত (৬ ছয় বৎসরের অধিককাল নহে) স্থগিত থাকে ও অশান্তিকর দর্শন সম্মুখে প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহা উচ্চ অবস্থার বলিয়া তত অসহ্য হয় না। সংসার বন্ধনের মধ্যে অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় যেমন অসুবিধা ও সুবিধার ভাবে মন নিরানন্দ ও আনন্দ ভোগ করে, তদ্রূপ ব্যাপার এই উচ্চ অবস্থার মধ্যেও হইয়া থাকে। এই আনন্দ ও নিরানন্দের মূল উক্ত বর্ণ দর্শনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যেমন শুক্ল পক্ষেতে চন্দ্র অল্পে অল্পে অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ আলোক লাভ করে, তদ্রূপ শ্রবণযোগ আরম্ভের পূর্ব্বে অল্পে অল্পে মনের বিশেষ শান্তি ও আনন্দকর দর্শন নয়ন গোচর হয়। তৎপর অশান্তি ও নিরানন্দজনক বর্ণালোক দর্শন হইতে হইতে, শ্রাবণযোগ নানা প্রকারে

প্রকাশিত হইয়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পে অল্পে অশান্তির ও নিরানন্দকর বর্ণ জ্যোতি হ্রাস হইয়া শান্তির আনন্দকর বর্ণালোক চিরকালের জন্য উদয় হয়, এবং সমুদয় জঞ্জাল দূর হইয়া যায়। তখন সাধক সন্দেহ রহিত হইয়া হৃদয়ে, মস্তকে, উদরে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানেও বাহিরে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করে এবং তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। তখন দর্শন ও শ্রবণযোগ একত্রে মিলিত হইয়া যায়। মনে করিলেই দিবারাত্রি সমভাবে অর্থাৎ আলোকে যেমন অন্ধকারেও তেমনি গুরুরূপী শুভ্রবর্ণ জ্যোতির মধ্যে আবশ্যকীয় বস্তু সকলের ভাব দর্শন করিয়া সকল প্রশ্নের সীমাংসা হয় এবং অশান্তি ও নিরানন্দ একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। স্থূল কথা এই যে, দর্শন আরম্ভ হইয়া বাণী শ্রবণ আরম্ভ হয়। পরে মধ্যে মধ্যে দর্শনের ভাব অল্প ও ক্রমে ক্রমে অধিক পরিমাণে শ্রবণের ব্যাপার বৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন মনের ভাবানুযায়ী বর্ণালোক অতি অল্পই দর্শন হয়, যে সকল বাণী শুনা যায় তাহাও সময়ে সময়ে নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। এইজন্যই মনের অশান্তি ও নিরানন্দ হয়। আবার ইচ্ছানুরূপ দর্শন ও বাণী শ্রবণের সফলতা দ্বারা সময়ে সময়ে মনে আনন্দোদ্‌গম হয়। কিন্তু এই উভয় শান্তি ও অশান্তির মধ্যে ঈশ্বরের সহিত যোগের শান্তি কিছুতেই হরণ করিতে পারে না। শেষ দর্শনের পর বাণী শ্রবণের পূর্ণতা হয় ও যাহার যতটুকু আবশ্যক তাহার ততটুকু কার্য্যোপযোগিতা লাভ হইয়া নিরানন্দ চলিয়া যায়। এই পৃথিবীতে অদ্যাপি কেহই এই শেষ সীমায় পদার্পণ করিতে পারেন নাই।

বাণীর যুক্ত ভাব ও যুঞ্জান ভাব, ইহার মধ্যে যুঞ্জান ভাব সাম্প্রদায়িকতার মূল

৫২। ঈশ্বরবাণীর যুক্ত ভাব এবং যুঞ্জান ভাব, এই দুই ভাব একজন সাধকের মধ্যে এক সময়ে অবস্থিতি করিতে পারে না। যুক্ত ভাব এই যে, চিন্তা ব্যতীত অনর্গল সর্ব্ব বিষয়ে বাণী প্রকাশ পায়। যুঞ্জান ভাব এই যে, চিন্তা দ্বারা আবশ্যকীয় বিষয়ে বাণী প্রকাশ পায়। বাণী প্রকাশের প্রথমে সময়ে লৌকিক আচার ও ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া হৃদয়ে যাহা প্রকাশ পায়, সাধক তাহাই করিতে প্রস্তুত হয়। কাহারও কথা শুনিতে ইচ্ছা করে না। কতকগুলি কার্য্য এইরূপ করিতে থাকে যে অন্যে তাহা বাতুলতার পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া মনে করে। এই অবস্থাতে নিতান্ত আত্মীয় লোকদিগের মনেও সন্দেহ আসিয়া অধিকার করে। সহযোগিতাতে যাহাদের বিশেষ নৈকট্য, কেবল তাহারাই পরিনামে মঙ্গল হইবে বলিয়া কথঞ্চিৎ স্থির বিশ্বাস লইয়া থাকিতে পারে এবং নিরাশ হইয়া পরিত্যাগ করে না। এইরূপে কেহ ১০ (দশ), কেহ বা ২০ (বিশ) বৎসর পর্য্যন্তও বিশেষ উন্নতির মুখ না দেখিয়া কাল যাপন করিতে পারে। কেহ বা এই অবস্থার মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করে। এই কারণেই মনের ভাব ও কার্য্যের গতি বুঝিতে না পারিয়া বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া লোকালয়ে থাকিতে মনের বিশেষ ইচ্ছা থাকে না। কেহ বা উক্ত অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাক্য, ভাব এবং কার্য্য দ্বারা লোকের আশ্চার্য্য উৎপাদন করে। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার বাক্যানুসারে আপন জীবনকে চালনা করা আবশ্যক মনে করে, তাহারা এক একটি নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট করে ও পরিচয়ার্থ এক একটি নাম গ্রহণ করে। এইরূপে প্রকাশ্যে ও

গোপনে কত প্রকার সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভবপর নহে। সিদ্ধ কার্য্য উপস্থিতির পূর্ব্বে এই সকল সম্প্রদায়িকতার নিবারণ হইয়া একতা সংসাধিত হইবার নহে। যুঞ্জান ভাবে যে বাণী শ্রবণ হয় তাহাই নানা প্রকার মতের মূল ও সাম্প্রদায়িকতার কারণ। বাণীর যুক্ত ভাব উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই সকল মতের ঐক্যযোগ লাভ হইয়া সকল পার্থক্য চলিয়া যায় ও সন্দেহ নিরাকৃত হয়। মানব জীবন সাধারণভাবে কার্য্য করে না। প্রত্যেকের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ যোগ রহিয়াছে। সেইভাবেই সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া সময়ে সকলেরই সিদ্ধ কার্য্যের যোগ লাভ হইবে। এই অভিপ্রায় সাধিত হইবার জন্য নানা প্রকার কার্য্যে ও ভাবে মানব জীবন কেবল সেই দিকেই চলিয়া যাইতেছে, সন্দেহ মাত্র নাই। বাণী শ্রবণ বিশেষ উন্নতির অবস্থা। মনের স্থিরতার জন্য ঈশ্বর তাহা প্রদান করেন। আবার যাহার যতটুকু কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, মন তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার অতিরিক্ত বিষয়ে ধাবিত হয় বলিয়াই শ্রবণের বাধা ও বুঝিবার গোলযোগ উপস্থিত হয়। সকল সন্দেহ চ্ছেদনের জন্য বাণীর যুক্ত ভাবের সময় উপস্থিত। সাধক! ভাবিয়া দেখ, অবশ্য বুঝিতে পারিবে।

জগতে একজন সুখী ও একজন দুঃখী দেখা যায় কেন

৫৩। মনুষ্য মধ্যে কেহ সুখী কেহ দুঃখী, একজন রাজা একজন প্রজা, একজন রোগী একজন সুস্থকায়, ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব দেখা যাইতেছে। ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং অপক্ষপাতী ; তাঁহার সৃষ্টিতে অমঙ্গল এবং পক্ষপাতীত্ব কি জন্য

বিচরণ করিতেছে? ইহার কারণ কেহ কেহ বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীরা পূর্ব্ব জন্মার্জিত কর্ম্মফল বলিয়া অবধারণ করে। পূর্ব্বজন্ম কল্পনা মাত্র। পূর্ব্বজন্মে কে কোথায় ছিল ও কি কার্য্য করিয়া কে জীবন শেষ করিয়াছিল তাহার লেশ মাত্রও কোন ব্যক্তির স্মরণ করিয়া বলিবার সাধ্য নাই। উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার বয়স্ক লোক, জ্ঞান বুদ্ধির প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও অজ্ঞান শিশু হইয়া মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির প্রভাব কি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইল? তিনি কি এক বস্তু ভগ্ন না করিয়া অন্য বস্তু গঠন করিতে অক্ষম? তিনি কি নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পারেন না যে এক বস্তুই পুনঃ পুনঃ অপরাপর রূপে গঠন করিয়া তাঁহার অসীম শক্তিকে খাট করিবেন? এইজন্য পুনর্জন্মের কথা অলীক ও কল্পনা মাত্র। প্রত্যেকে বস্তু ও আকৃতি অপ্রয়োজনে বা বিনাশ প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হয় নাই, কেননা তাহার প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর সহিত জগতের চিরসম্বন্ধ রহিয়াছে। ঈশ্বরের কার্য্য সকলই পূর্ণ। অপূর্ণ ভাব যাহা তাঁহাতে দৃষ্ট হয় তাহা তাঁহার কার্য্য প্রণালী আলোচনা করিয়া বিশেষ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে, বোধ হইবে যে এই বাহ্য অপূর্ণতার আবরণে পূর্ণতা অভ্যন্তরে আছে। অতিশয় ক্ষুদ্র বীজ হইতে অতি বৃহদাকার বট বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য দ্বারা কত কত আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। যতই অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা হইতেছে ততই নূতন নূতন বিষয় সকল আবিষ্কৃত হইয়া মনুষ্যের আশ্চর্য্য উৎপাদন করিতেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ইহলে নিতান্ত তুচ্ছ বস্তুর দ্বারাও মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পন্ডিত ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তি ও মঙ্গলভাবের প্রতি সংশয় প্রকাশ করেন। ইহার কারণ এই যে তাঁহারা জানেন না আংশিক শক্তি

ও অমঙ্গলের ভাব সৃষ্টিতে না থাকিলে সর্ব্বশক্তির কোন গৌরবই মনে উদয় হইতে পারে না। যদি অন্ধকার না থাকিত তবে আলোকের জন্য মন ব্যগ্র হইত না ; যদি অপূর্ণতা না থাকিত তবে পূর্ণতার জন্য কেহই পিপাসু হইত না। অভাব হইলেই মন ভাবানুসন্ধান করে। যদি অভাব পূরণের জন্য মনের বেগ না হইত, যদি অসার দেখিয়া মনের উচ্ছ্বাস সারের দিকে না যাইত, তবে বুঝিতাম যে ঈশ্বরের শক্তি সীমাবদ্ধ। যখন তাহা হয় না ও সর্ব্বদাই মন উন্নতি হইতে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে শক্তিহীনতা অমঙ্গল যাহা সংসারে দৃষ্ট হয়, তাহা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তারই পরিচয় দিতেছে। এইক্ষণ পূর্ব্বজন্ম না থাকিলে তাহার কোন কার্য্যের ফলাফলের সহিত বর্ত্তমান সময়ের মঙ্গলামঙ্গলের কোন সম্বন্ধ নাই ইহা স্থিরীকৃত হইল। নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অমঙ্গলের মধ্যেই ঈশ্বরের পূর্ণতা লুক্কায়িত আছে ইহাও বিবেচিত হইল। বিশেষতঃ সুখ দুঃখ মনেতে। বাহিরের কার্য্যের যোগ হৃদয়ে না হইলে সুখ ও দুঃখের অনুভব হয় না। অনেক সময় বাহিরের দুঃখ সত্ত্বেও মনের শান্তি স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। বহু জন ও ধন সম্পত্তি চতুর্দিকে বর্ত্তমান, অথচ অনেক সময় মনের শান্তি থাকে না। এ স্থলে মানসিক শান্তি ও অশান্তির পরিমাণ নিশ্চিত না হইলে কোন্ ব্যক্তি সুখী ও কোন ব্যক্তি দুঃখী তাহা স্থির করা কঠিন। কুটীরস্থ ভিক্ষুক দিনান্তে একাহার করিয়াও যে সুখ অনুভব করে, রাজসিংহাসনস্থ রাজাও অনেক সময় তাহা পাইতে ইচ্ছা করেন। অথচ সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে ও মনুষ্যের মনকে আপন আপন গম্যস্থান ঈশ্বরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। মনুষ্য আপন আপন ভাবে কার্য্য করিতেছ। উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য যাহার নিমিত্ত যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট

আছে, তাহার মধ্য দিয়া জানিত বা অজানিতভাবে জীবনের আশা সফল করিবার জন্য প্রধাবিত হইতেছে। অভ্যাস যোগেতে একজনের নিকট যাহা সুখ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অন্যের নিকট দুঃখের ভাব প্রদান করে। আবার একজনের নিকট যাহা ভাল, অন্যের নিকট সেইরূপ কার্য্য ভাল বোধ হয় না। এইজন্য বাহিরে কার্য্য দৃষ্টে এই ব্যক্তি সুখী ও এই ব্যক্তি দুঃখী, এইরূপ বিচার করে অলীক ও অজ্ঞানতার কার্য্য। বাহিরের দুঃখের ব্যাপারের মধ্যে যে ব্যক্তি কিছুকাল থাকিয়া ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিয়াছে তিনিই তাহা বুঝিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে বাহ্য সুখ ও দুঃখের ব্যাপার অতি তুচ্ছ। তিনি রাজসিংহাসন, ধন-সম্পত্তির সুখের জন্য লালায়িত হয়েন না। এক সময়ে একজন দুঃখী ও অসুখী হইলেও সময়ান্তরে তাহার দুঃখ দূর হইয়া সুখের ভাব এত অধিক হয় যে পূর্ব্বের সকল দুঃখ সে ভুলিয়া যায়। এক সময়ের অভাব অন্য সময়ে পূরণ হইয়া সুখ দুঃখের তারতম্য দূর হইয়া যায় ; এইজন্য কোন্ প্রকারের দুঃখ কি সুখের মধ্য দিয়া কোন্ সময়ে ঈশ্বর কাহাকে কি পরিমাণে শান্তি দিতেছেন তাহা মানুষ বুঝিতে অক্ষম। অতএব এ বিষয়ে কেবল এই মাত্র ধারণা মনে রাখা আবশ্যক যে প্রত্যেক মনুষ্য অন্যের সহিত তুল্য পরিমাণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেছে। ঠিক ভাবে পরিমাণ করিতে পারিলে সুখ দুঃখের ব্যক্তিগত তারতম্য কখনই অনুভূত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি এই বৈলক্ষণ্য মনে রাখিয়া কার্য্য করে তাহার নিকট স্বর্গীয় সুসংবাদ আসিতে পারে না।

প্রকৃত বিবাহ

৫৪। বিবাহ কার্য্য জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। জগতে যে যেরূপ বিহারে প্রথা প্রচলিত আছে তাহা বাহ্যিক বন্ধনের ব্যাপার। যে সমাজে উভয় সম্মতি মতে কার্য্য হয়, তাহাতেও বাহ্য বিষয়কে অনেক পরিমাণে লক্ষ্য করে। আন্তরিক ঐক্য বন্ধন যে কি এক স্বর্গের সম্পত্তি, তাহা মনুষ্য বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, অদ্যাপি জানিতেও সক্ষম হয় নাই। যে আন্তরিক ঐক্য দ্বারা দুই শরীর এক হয় ও সংসার এবং স্বর্গ এক স্থানে মিলিত হয় তাহারই নাম বিবাহ। বিবাহকার্য্য সিদ্ধ যোগেতে আছে। মনের শান্তি, সাংসারিক ও ঐশ্বরিক যোগ, সকলই প্রকৃত বিবাহের শুভ ফল। বিবাহকার্য্যে ব্যত্যয় ঘটাতেই পৃথিবী রোগ, শোক ও মৃত্যুর বিষময় ফল প্রসব করিতেছে। পৃথিবীতে শুভ যাহা কিছু আছে- তাহার মূল আধ্যাত্মিক প্রেমযোগ; ইহা ঈশ্বর ইচ্ছাতে স্ত্রী ও পুরষদিগের হৃদয়ে কিছু জানিত ও কিছু অজানিতভাবে বিচরণ করিতেছে। আধ্যাত্মিক ভাবে মিলনের যোগ পূর্ব্বে উপস্থিত না হইলে, কোন ব্যক্তির সহিত কোন ব্যক্তির প্রেম হইতে পারে না। যত বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি অমঙ্গলের ব্যাপার দেখা যায়, তাহাও আধ্যাত্মিক বিষমযোগের ফল। কিন্তু শারীরিক বিবাহযোগ বিশেষ ভাবে থাকিলে, অন্ততঃ এ সমুদয় অমঙ্গলের সংশোধন হইতে পারিত, তাহাও না থাকা অমঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই। বিবাহযোগ ধর্ম্মের ন্যায় সকল প্রকারের বিষমযোগ হইতে রক্ষা করিয়া গরলকে অমৃতে পরিণত করে, প্রত্যেকের জন্য জগতে যাহা আবশ্যক তাহা আনয়ন করে এবং জগতের সহিত মানুষকে আত্মীয়ভাবে মিলিত করে। শান্ত ভাবে যাহারা ঈশ্বর সাধনে রত, আধ্যাত্মিক ভাবে তাহাদের বিবাহের যোগ আরম্ভ হয়। বিবাহযোগ শরীরেতে কার্য্য না করিলে তাহা সাধনের শেষ ফল লাভ করিতে

পারিবে না। মানুষ সংসার পরিত্যাগ ও ভাই বন্ধু সকল হইতে দূরে গমন করিয়া, নানা প্রকার সাধন অবলম্বন পূর্ব্বক, কেহ বা শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা জীবিত থাকিয়াও আপন অভীষ্ট লাভে অদ্যাপি হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বিবাহযোগ লাভ না করিয়া জীবনাশা সফল করিতে পারিবেন না। চৈতন্য, বিবাহযোগ সাধনের কণ্টক ও তাহা এ সময়ে প্রকৃতরূপে হইতে পারে না জানিয়া স্বয়ং ডোর কৌপিন ধারণ পূর্ব্বক শিশ্রগণকে এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পথ প্রদর্শন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা জীবন-মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া লোকেতে প্রকাশ আছে, তাঁহাদের জীবন কোথায় যে তাহা দেখিয়া জীবন-মুক্তির লক্ষণ উপলব্ধি হইবে? বাস্তবিক কেহই অদ্যাপি জীবন-মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এমন সময় শীঘ্রই আসিবে, যখন ঈশ্বর মানবগণ সফল মনোরথ হওয়ার জন্য প্রকৃত বিবাহযোগ পৃথিবীতে আনিয়া দিবেন ও পরমানন্দ লাভে কৃতার্থ করিবেন।

মুক্তি

৫৫। শরীর ও আত্মার ভাব ও কার্য্যের ঐক্য-ভাবের নাম মুক্তি। যদিচ শরীর ও আত্মা একই এবং ব্রহ্মভূত পদার্থ তথাপি এ উভয়ের ভাব ও কার্য্যে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রভেদ চলিয়া গিয়া যখন একতার কার্য্য হইবে, তখনই বিকার শূন্য হইয়া মন আনন্দময় হইবে ও মানুষ মুক্তি লাভ করিবে। হিন্দুশাস্ত্রে এই মুক্তি সমীপ্য, সারূপ্য, সাযোজ্য, সালোক্য, কৈবল্য, নির্ব্বাণাদি নানা প্রকার লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত সকল প্রকার মুক্তিই যে শরীর অবস্থানে জীবগণ লাভ করিতে

পারিবে মানুষের মনে এমত ভাব ও বিশ্বাস আছে বলিয়া বোধ হয় না। লোকের ধারণা যে কেবল মুক্তির আরম্ভ মাত্র এ জীবনে দেখা যাইতে পারে। খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায়ের মতে "ডে অব্ ট্রায়েল" "রোজ্ হাসর্" অর্থাৎ শেষ বিচারের একটি দিন সকলের জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। সে সময়ে লোকের পাপ ও পুণ্য কার্য্য ঈশ্বর সাক্ষাৎ বিচার হইয়া প্রত্যেক মৃত মনুষ্য সমাধি হইতে উত্থান পূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিবে, তাহাদের শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। ইহার দ্বারা ও মৃত্যুর পরেই মুক্তি, ইহাই উপলব্ধি হইতেছে। এইক্ষণ দেখিতে হইবে যে মৃত্যুর পর বিকার-মূলক সুখ দুঃখ অবিকৃত আত্মাতে কার্য্য করিতে পারে কি না? যদি পারে এমত কেহ বলেন, তবে তিনি আত্মার স্বরূপ অবগত নহেন। স্থূলরূপে যাহা দর্শন হয় কেবল তাহাতেই, ঈশ্বর হইতে পৃথক ভাবে মনের যোগ স্বরূপে সুখ দুঃখের কার্য্য প্রত্যক্ষ হয়। সূক্ষ্ম আত্মাতে দুঃখ নাই বলিয়াই অনেকে দুঃখের আধিক্য হইলে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে এই শরীর ত্যাগ করিলেই সকল দুঃখের অবসান হইবে। বাস্তবিক পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার কোন প্রভেদ নাই, কেবল জীবাত্মা শরীরে থাকিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কোন কর্ম্মফল ভোগ করে না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য প্রতিপাদন না করিলে এই কথার সামঞ্জস্য হইতে পারে না বলিয়াই, দুই পক্ষের একটি সাক্ষী স্বরূপ ও একটি ফলভোগী উপনিষদে এইরূপ ভাবের বাক্য লিখিত হইয়াছে। শরীর পরিত্যাগ হওয়ার পূর্ব্বে আত্মাতে আমিত্বের যোজনা দ্বারা ঈশ্বর হইতে আমি পৃথক, মনে এই একটি যোগ অবস্থিতি করে। শরীর ব্যতীত তাহা থাকিতে পারে না ; সুতরাং মুক্তি ও বন্ধন, সুখ ও দুঃখাদি শুভাশুভ অনুভূত। কেবল আত্মাতে তাহা তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই শরীর ধ্বংস হইলে যে মুক্তি

তাহা ঊর্ম্মিমালা মহাসাগরের জলে বিলীন হইয়া যাওয়ার ন্যায় অস্তমিতযোগ। এই প্রকার মুক্তি যে কাহারও প্রার্থনার ভাবের মধ্যে আছে তাহা বোধ হয় না। "আমাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অধিকার কর" অথবা "আমি তোমাতে মিশিয়া যাই" ইত্যাদি সকল প্রকারের প্রার্থনার অভ্যন্তরেই এই ভাবটি নিহিত রহিয়াছে যে, আমার অস্তিত্বের বোধটি যেন থাকে। শরীর বিনা এই অস্তিত্ব বোধ থাকিতে পারে না, এইজন্য আপন আপন শরীর অবস্থানে যে মুক্তি তাহাই মনুষ্যের প্রার্থনীয়। প্রতিনিয়ত ঈশ্বর সমীপে স্থিতিজ্ঞানের নাম সামীপ্য মুক্তি। সকলই তাঁহার রূপ, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও সর্ব্বদা মনে ভাব, ইহার নাম সারূপ্য মুক্তি। সর্ব্বদা তাঁহাতে হৃদয়, মন ও শরীরের যোগ, ইহার নাম সাযোজ্য মুক্তি। তাঁহার সহিত যাহাদের বিশেষ যোগ আছে তাহাদের সহিত সর্ব্বদা সহবাস, এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের নাম সালোক্য মুক্তি। কেবল একমাত্র তিনিই সকল, এতদুপলব্ধির নাম কৈবল্য মুক্তি। তাঁহাতে একবারে সমাধি হওয়ার নাম নির্ব্বাণ মুক্তি। ইহার প্রত্যেক প্রকারের মুক্তির ভাবই এ জীবন থাকিতে হইতে পারে, ভাবুক হৃদয় ইহা অস্বীকার করিবে না। এই মুক্তি কেহই অদ্যাপি লাভ করিতে পারে নাই। সময়ে সময়ে যে সকল মহাপুরুষগণ জগতে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের আপন মত কয়েকটি লোকের মধ্যে প্রচার করিয়াই লীলা সংবরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জীবন-মুক্তি রূপ সিদ্ধযোগ লাভ না করাতেই জগতে একমত সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের সাময়িক প্রয়োজনীয় কার্য্য যাহার যেরূপে করা আবশ্যক ছিল, তাহাই তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারিত সত্য সকল জগতে সংক্রামিত হইয়া একতার যোগই দিতেছে সন্দেহ নাই। ঐক্যভাব সম্পাদনের বিশেষ সময় এইক্ষণ উপস্থিত। ব্রাহ্ম সমাজ ইহার পূর্ব্বকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এ সময়ে একটি পূর্ণ সিদ্ধ ব্যক্তির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ; যাঁহার জীবন-মুক্ত-ভাব দর্শনে আস্থা

স্থাপন করিয়া সকলেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগে দীক্ষা লাভ করিবে। সকলেই এই জীবন-মুক্তির অধিকারী, কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। সর্ব্ব প্রকারের পার্থক্য পরিত্যাগ করিয়া সকলেই নাম-যোগ সাধন করিলে অমরত্বের যোগে জগতে একতা আসিবে ও ধর্ম্ম মতের আর অনৈক্য থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর এবং তাঁহার নাম এক এবং একই ; এ উভয়ের কোন পার্থক্য নাই। ঈশ্বরেতে যাহা আছে তাঁহার নামেও তাহা আছে, ইহাতে স্থির বিশ্বাস হইলে অন্য প্রকার সাধনের কোন আবশ্যক থাকে না। এই নাম-যোগের পর ধ্যানযোগ লাভ করিয়া মনুষ্য শরীর সাধন পূর্ব্বক রোগ, শোক ও মৃত্যু হইতে নির্ভয় ও জীবন-মুক্ত হইবে।